প্যারাবোলা স্যার

নারায়ণ সান্যাল

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৬৪

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ২৯
প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়
মুদ্রাকর
বিশ্বনাথ কবিরাজ
গঙ্গামুদ্রণ

কলকাতা ৪

প্যারাবোলা স্যার

: কোনটা নেব ঠিক করে বল না গো ?

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস আটকে যায় টনির বুকে। যত দিক দিয়ে সম্ভব প্রশ্নটা আলোচিত হয়েছে—'প্রজ এ্যাণ্ড কন্‌স্‌', পক্ষে এবং বিপক্ষে। চূড়ান্ত নির্বাচন, যাকে বলে 'কাস্টিং ভোট' সেটা দাখিল করার দায়িত্ব ওর নয়। জানা আছে সে-কথা। ওকে শুধু বুঝে নিতে হবে কোনটাকে চিহ্নিত করলে ঠিক গোড়ে গোড় দেওয়া হবে। অর্থাৎ মনে মনে যে শাড়িটা ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত নির্বাচন করে রেখেছে সুরমা, সেটাকে চিহ্নিত করা। স্ত্রীর চোখে চোখে একবার তাকালো ; তারপর গভীর অভিনিবেশে দেখতে থাকে কাউন্টারে থাক দেওয়া বেনারসী শাড়ি তিনখানিকে। ঠিক যে ভঙ্গিতে হস্তরেখাবিদ খদ্দেরের প্রসারিত হস্তের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, অথচ দেখে না কিছুই, মনে মনে আঁচ কষে ঐ প্রসারিতকর মানুষটি সে মুহূর্তে ঠিক কী ভাবছে : পরীক্ষার পাস-ফেল, মেয়ের বিয়ে, চাকরির নিরাপত্তা অথবা নিকট আত্মীয়ের অসুখের কথা—সেই ভঙ্গিতেই টনি শাড়ি-গুলোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েও ভাবছিল : ওর কোনটা পছন্দ ! ঐ সাদারঙের জামদানি, চন্দনরঙের চওড়া-আঁচলা, না আকাশী রঙের বুটিদার—এর কোনটা ? সেল্‌সম্যান সুরমাকে অনুরোধ করেছিলেন ; পাট ভেঙে একে একে শাড়িগুলি বুকের উপর লুটিয়ে প্রমাণ-সাইজ আয়নায় দেখতে। সুরমা রাজী হয়নি ; বাধ্য হয়ে মাঝবয়সী ভদ্রলোক নিজেই কসরৎটা দেখিয়েছেন—পাঞ্জাবির উপর দিয়ে শাড়িটা লেপটিয়ে। সে-সব পর্ব অনেককাল খতম হয়ে গেছে। রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে—এই আভ্যন্তরি আর ভালো লাগছিল না টনির। এ দোকানে যখন ঢুকেছে তখনও গোধূলির আলো ম্লান হয়নি। ঘণ্টা দেড়-দুই কেটে গেছে তারপর।

আশ্চর্য ধৈর্য সেল্‌স্‌ম্যান ভদ্রলোকের। এই জাতীয় অধ্যবসায় নিয়ে সাধন-ভজন করলে এতদিনে পরমহংস হয়ে যেতেন নিশ্চয়!

: কি হল ? বল না কোনটা মানাবে আমাকে ?

শাড়ি তিনখানির দাম পিঠোপিঠি। বিশ পঁচিশ টাকার এদিক ওদিক। জন্মের মধ্যে কম্ম একবারই বেনারসী শাড়ি কিনে দিচ্ছে স্ত্রীকে—সুতরাং ওদিকটা না ভাবলেও চলবে। অতসীর জন্যে যদি একা কিনতে আসত তাহলে টনি ঐ চন্দনী শাড়িখানাই কিনত। অতসীর গায়ের রঙ যদিও সুরমার চেয়ে ফর্সা। টনির আন্দাজ—সুরমার পছন্দ ঐ সাদাখানাই। তাব স্বপক্ষে যুক্তিটাও শুনিয়েছে সুরমা—এখানা বেশি বয়স পর্যন্ত পরা যাবে ; সাদা খোল তো! টনি জবাবে বল্‌তে পারত, বলেনি যে, সুরমা ফর্সা নয়—সাদা রঙে তাকে মানাবে না। বস্তুত তার চেয়ে ঐ আকাশী রঙের বুটিদারখানাই চলতে পারে! সাদাখানা টনির সবচেয়ে অপছন্দ।

: সাদাটাই নিই, কি বল ? ওটা অনেক বেশী বয়স পর্যন্ত পরা যাবে!

এই নিয়ে সাতবার শুনল কথাটা। বলে, আমি তো তখন থেকে ওটাকেই নিতে বল্‌ছি।

: কিন্তু আমাকে কি মানাবে ?

আবার সেই পুনর্মূষিক!

ঠিক তখনই দোকানে প্রবেশ করলেন এক বৃদ্ধ ক্রেতা। গায়ে হাফ-হাতা একটা ফতুয়া, মেরজাইয়ের মতো পাশে বোতাম। ধুতি খাটো, হাঁটুতক্‌। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, হাতে মোটা লাঠি। বয়স ষাটের ওপারে, মাথা-ভরা টাক, কিন্তু গায়ের রঙ এখনও টকটক করছে।

: এক মিনিট স্যার! আপনারা পছন্দ করুন—সেল্‌স্‌ম্যান এগিয়ে যায় বৃদ্ধের দিকে ; আসুন, আসুন স্যার!

বৃদ্ধ বসলেন। চটি খুলে ফরাসপাতা গদির উপর। বললেন,

ছোট ধুতি দেখান তো একখানা। বছর আষ্টেক বয়সের ছেলে। তাঁতের ধুতি—

: এই যে দেখাই।—সেল্‌স্‌ম্যান করিৎকর্মা। মুহূর্তমধ্যে হাজির করে ছোট ছোট ধুতি। কত কাউন্টের সুতো, কত দাম, পাখিপড়া বলতে থাকে। কথা বলতে বলতেই বাড়িয়ে ধরে তবক্‌মোড়া বেনারসী খিলি পান। বৃদ্ধ শিরশ্চালনে অস্বীকার করেন: দাঁত নেই ভাই! পান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

: তাহলে একটা কোক্‌? এই নেত্য···

দোকানভৃত্য নেত্য তৎক্ষণাৎ রওনা দিচ্ছিল। বৃদ্ধই বাধা দিলেন: না না। আমার সন্ধ্যাহ্নিক এখনও সারা হয়নি।

: তাহলে সিগারেট নিন? ধূমপানে তো দোষ নেই? আসুন—

: ওঃ! তুমি দেখছি নাছোড়বান্দা! আচ্ছা দাও!

সিগ্রেট নিলেন ভদ্রলোক! দোকানদার স্বহস্তে লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিল। লম্বা একটা টান দিয়ে ভদ্রলোক বাচ্চার ধুতিতে মনোনিবেশ করলেন। দোকানদার গরুড়পক্ষীর মতো তাঁর সঙ্গে সেঁটে রইল। টনি বুঝতে পারে—বৃদ্ধ অনেক দিনের খদ্দের। তাই ঐ ছয় হাতি ধুতির ক্রেতার এত খাতির। ওরাও অবশ্য কোকাকোলা সেবন করেছে, তবক দেওয়া পান খেয়েছে; কিন্তু ওরা এসেছে বেনারসী শাড়ি কিনতে। তিন চার শ' টাকার খানদানি খদ্দের।

: এই! বল না গো! কোনটা নিই?

: উঁ? তাই তো ভাবছি!

সুরমা শাড়ি তিনটার স্থান বদল করল—আকাশীটা এল প্রথম, তারপর সাদা, তারপর চন্দন-রঙের খানা। যেন টেক্কা-বিবি-গোলামের হাতফিরি হচ্ছে! আবার দুজনে দেখতে থাকে গভীর অভিনিবেশে।

ভদ্রলোক টাকা মিটিয়ে ধুতিখানা বগলদাবা করে রওনা দিলেন। তখনই উঠল একটা সোরগোল: ওম্ শম্ভো! শিব শম্ভো!

সার বেঁধে পুজারীরা চলেছে মন্দিরমুখো। শয়নারতি হবে এবার। ওরা বেরিয়ে এল দোকানের সামনে। শোভাযাত্রাটি শঙ্খঘণ্টা ধ্বনিতে বিশ্বনাথের গলিকে সচকিত করে মন্দিরের দিকে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। সুরমা বলে, চল শায়নারতি দেখে আসি!

: কিন্তু শাড়ি? কোনখানা নেবে স্থির করলে?

: তাই তো জিজ্ঞাসা করছি তখন থেকে। বল না গো, কোনখানা নিই?

অসহ্য!

শাড়ির প্যাকেট বগলদাবা করে টনি যখন বেবিয়ে এল রাস্তায়, তখন দোকানপাট বন্ধ হতে শুরু করেছে। সুরমা বলে, যাবে শয়নারতি দেখতে? এখনও শেষ হয়নি বোধ হয়…

হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে টনি বলে, না থাক! এমনিতেই অনেক রাত হয়ে গেছে। মা একা বসে আছেন হোটেলে। চল—ফেরা যাক। এরপর হোটেলে খাবার হয়তো পাওয়া যাবে না। নিতুনও ঘুমিয়ে পড়বে!

সুরমা একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, এই জন্যেই বলেছিলাম কাশী থাক, চল দার্জিলিঙে যাই। গরীবের কথা তো কানে গেল না তখন!

টনি আর কথা বাড়ায় না। একথার জবাব নেই। হ্যাঁ, বলেছিল বটে সুরমা। কাশীর বদলে দার্জিলিঙে যেতে। এবং দার্জিলিঙ হলে মা নিশ্চয় আসতে চাইতেন না। আর মা না এলে নিতুনকে তাঁর ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করত সুরমা। একেবারে ঝাড়া-হাত-পা 'হনিমুনী' কপোত-কপোতী। একথা স্বীকার করে টনি—সাত বছরের বিবাহিত জীবনে বৌ নিয়ে এতদূর বেড়াতে আসার বন্দোবস্ত করে উঠতে পারেনি। নিতুন হবার আগে ওরা কোথায় কোথায় গেছে? ঐ দীঘা-তক্। মানে মসজিদ্ পর্যন্ত। তখন নানা বখেড়াও থেছে

জীবনে। রোজগারও ছিল অল্প। সেল্‌স্‌ থেকে পারচেজে বদলি হয়ে আসার পরই এখন দুটো পয়সার মুখ দেখছে। কোম্পানির দেওয়া উপরি মাহিনা ছাড়াও পার্টির দেওয়া এক্সট্রা কমিশন (ও কথাটার বাঙলা হয় না ; হয়, তবে বড় অশ্লীল !) আসবে পকেটে। তাই এই পশ্চিমে বেড়াতে যাবার কথা উঠেছিল। কিন্তু নিতুন এখন ছেলেমানুষ নয়—মায়ের ঘাড়ে তাকে চাপিয়ে কপোত-কপোতী যৌথভ্রমণে এলে সারাটা ছুটি বেচারি কেঁদে-কেঁদে মরত। আশ্চর্য ! মা হয়ে এটা খেয়াল করে না সুরমা ? আর মায়ের কথাই ধর না কেন ? সারাটা বছর ঐ ঠাকুর দেবতা নিয়ে ভুলে আছেন। গোপালকে খাওয়াচ্ছেন, চান করাচ্ছেন, মশারি টাঙিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন। শোক তাপ তো সারাটা জীবনে বড় কম পাননি। দাদার মৃত্যু, অতসীর দুর্ভাগ্য, সমস্ত জীবনভর স্বামীর কাছেই বা কী পেয়েছেন ? অবহেলা আর অনাদর ! জেদি এক রোখা একটা মানুষের সঙ্গে পঞ্চাশ বছর কাটিয়ে দিতেই তো তাঁর হাড়-মাস ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এখন অবশ্য স্বামীর অত্যাচার নেই। সে বালাই চুকেছে—কিন্তু তাতেই কি শান্তি পেয়েছেন ? টনিই তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্র। তার কি উচিত নয় তাঁকেও একটু তৃপ্তি দেওয়া ? তাঁরও তো প্রায় পঁয়ষট্টি বছর বয়স হল। আজ আছেন, কাল নেই। বাবা বিশ্বনাথের মাথায় গঙ্গাজল ঢালার সামান্য বাসনাটুকু টনি যদি চরিতার্থ করতে পারে এই সুযোগে—

: এ্যাই শুনছ ? ঐ দেখ জুঁইয়ের মালা বেচছে ! কিনবে ?

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। এতক্ষণে বিশ্বনাথের গলিটা পার হয়ে ওরা বড় রাস্তার কাছাকাছি এসে পড়েছে। সুরমার প্রসারিত তর্জনী লক্ষ্য করে ফুলওয়ালীও এগিয়ে এসেছে। টনি বলে, এখন আর ফুলের মালা কিনে কি হবে ? বিকেলে টিকেলে কিনলেও না হয় মানে হত। এখন তো হোটেলে গিয়ে শুয়েই পড়বে। আর তাছাড়া—

কথাটা শেষ করে না। বুঝতে অবশ্য অসুবিধা হয় না সুরমার। হোটেলে একটিই বড় ঘর ভাড়া নিয়েছে। দুখানি ডবল-বেড খাট।

একটায় টনি আর নিতুন, আর একটায় শাশুড়ী-বউ! সে পরিবেশে রাত্রের আয়োজনেও জুঁইয়ের মালা নিরর্থক। এই একখানা ঘর ভাড়া নেওয়া নিয়েও স্বামীস্ত্রীতে ইতিপূর্বে কথা-কাটাকাটি হয়েছে। তাই ঐ 'তাছাড়া' শব্দযুক্ত বাক্যটা অসম্পূর্ণই রয়ে গেল।

: এ্যাই রিক্সা! ভাড়া যায়েগা? গোধূলিয়া যানেসে, কেৎনা লিগা?

রিক্সাওয়ালা ওর চেহারা দেখেই বুঝেছে—সদ্যআগত কলকাত্তাইয়া। দেড়া ভাড়া দাবী করে বসে তৎক্ষণাৎ কিন্তু কালীঘাটের সেলস্-পার্চেসের ধুরন্ধর টনি চক্কোত্তিও চালুমাল। দরদাম করে সে রেটটাকে নামিয়ে আনে ন্যায্যভাড়ার কাছাকাছি। মাঝামাঝি রফা হয়। টনি আর সুরমা উঠে বসে ত্রিচক্রযানে। একশ আশি ডিগ্রি মোড় ঘুরে বিচিত্র ধ্বনি তুলে সেটা যাত্রা করে গোধূলিয়া-মুখো। গাড়িতে আর কথা হয় না কিছু। দুজনেই ডুবে যায় যে যার চিন্তায়।

সুরমা ভাবছিল সদ্য কেনা শাড়িটার কথা। দারুণ একটা দাঁও মারা গেছে এ্যাদ্দিনে। দার্জিলিঙে গেলে এটা হত না কিন্তু! বড়জোর কিছু ঝুটোপাথরের মালা। অথবা ঘর সাজানোর কিছু হাবিজাবি—কাঞ্চনজঙ্ঘার রঙিন ছবি, আখরোট কাঠের তেপায়া টেবিল বা ঐ জাতীয় কিছু জঞ্জাল। সশাশুড়ী কাশী আসতে রাজী হয়েছিল বলেই না আজ এই বেনারসীর দাঁওটা মারা গেল। একদিক থেকে ভালই হল। বেনারসী ওর কুল্লে একখানি—সেই আগুন রঙেরখানা। বিয়ের বেনারসী। নেহাত বিয়ে বাড়ি ছাড়া তা পরা যায় না। এ্যাদ্দিনে যেন সেই বাক্সবন্দী আগুনরঙা মেয়েটি দোসর পেল। এরপর ওর ট্রাঙ্কে উপর নিচে জড়াজড়ি করে থাকবে ওরা দুজন—আগুনরঙা কোন্নগরের কনে আর এই বেনারসের বুটিদার বর। কিন্তু ওকি ভুল করল? ঐ চন্দন রঙের খানাই কি কেনা উচিত ছিল? কাল সকাল বেলা আর একবার এসে বদলে নিয়ে যাবে?

ওদের রিসার্ভেশন তো রাতের ট্রেনের। সকালে বদলে নেবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে…

টনিও নিমগ্ন ছিল নিজের চিন্তায়। না, নিজের কথায় নয়। ঐ দোকানদার ভদ্রলোকের একটা কথায় ভাবনার খোরাক পেয়ে গেছে ও। টনি চক্কোত্তি সেলস-এ ছিল এতদিন। সুতরাং কথাটা ওকে যতটা ভাবিয়ে তুলেছে অন্য কোনও প্রফেশনের লোক হয়তো এতটা ভাবত না। ওর মনে হয়েছিল—সেই বৃদ্ধ ক্রেতা ভদ্রলোক ঐ দোকানের অনেক দিনের খরিদ্দার। বছরে অনেক টাকার মাল কেনেন। নিঃসন্দেহে নিজের জন্য নয়। কারও এজেন্ট হিসাবে। সে যেমন কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করে। ঐ ফতুয়াপরা তাল-পাতার চটি ফট্‌ফট্‌ ফোতো কাপ্তেন নিশ্চয় সেই রকম কোনও নেপথ্যবাসী কাপ্তেনের বাজার সরকার অথবা পোষ্য—মালিক বা হুজুরের সম্পর্কে খুড়ো জ্যাঠা। এত কথা আর পাঁচজন ভাবত না। টনি ভাবল। সে ঐ কেনা বেচার বাজারের মানুষ বলেই। কোম্পা-নির জুনিয়ার সেল্‌স্‌ম্যান হলেও মাঝে মাঝে সেমিনারে যেতে হয়েছে তাকে। ওর তাই মনে পড়ে গিয়েছিল মুখার্জিসাহেবের সেই পেপার : হাউ টু এ্যাসেস্‌ দ্য বায়ার এ্যাট ফার্স্ট লুক! [প্রথম দর্শনেই কিভাবে ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা বুঝে নিতে হয়]। প্রথম দর্শনেই টনি চক্কোতি বুঝে নিয়েছিল, উনি বেনারসী শাড়ি কেনার মতো মানুষ নন, বড়জোর বাঁদিপোতার গামছার পেটি খদ্দের। কিন্তু পর্বতঃ বহ্নিমান ধূমাৎ! ঐ ফতুয়াধারীর জন্যই হুকুম হল কোকাকোলার, এল জর্দা দেওয়া পান, লাখ টাকার মাল যে দোকানে মজুত তার বয়স্ক সেল্‌স্‌ম্যান স্বহস্তে সিগারেট ধরিয়ে দিলেন। সিদ্ধান্ত : খরিদ্দার যে একজন নেপথ্যবাসী রাঘববোয়ালের বাজার সরকার এটা জানা ছিল দোকানদারের। কৌতূহলটা এত তীব্র হয়েছিল যে, টনি প্রশ্নটা পেশ না করে পারেনি : উনি কে?

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ততক্ষণে তালপাতার চটি ফট্‌ফট্টাস করতে করতে

বিশ্বনাথের গলির বাঁকে মিলিয়ে গেছেন। দোকানদার ভদ্রলোক ফিরে এসেছেন কাউন্টারে মূর্ছিতা বেনারসীএয়ীর আসরে। বললেন, কে? ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোক? জানি না তো!

একটু থতমত খেয়ে যায় পাকা সেল্‌স্‌ম্যান টনি চক্কোত্তি। বলে, উনি বুঝি প্রায়ই কিনতে আসেন এ দোকানে?

: আজ্ঞে না! ওঁকে এই প্রথম দেখলাম।

: ও!

ভদ্রলোক হাসলেন। বলি কি বলি না ভঙ্গিতে শেষবেশ বলেই ফেললেন, কলকাতায় থাকেন মনে হচ্ছে, উত্তরে না দক্ষিণে?

: দক্ষিণে। অমৃত ব্যানার্জি রোডে, মানে কালীঘাটে।

ভদ্রলোক উইলস্‌-এর প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরে বলেন, আসুন।

টনি একটি সিগারেট তুলে নেয়। উনি নিজেও একটি ধরালেন। ধরিয়ে দিলেন টনিরটা। তারপর বললেন, আমি জানি, আপনি কী ভাবছেন। ভদ্রলোককে দেখেই বোঝা যায়—বেনারসী কিনবার মত সঙ্গতি ওঁর নেই—তাই নয়?

: না, তা ঠিক নয়। মানে···আপনি যেভাবে ওঁকে খাতির যত্ন করলেন'···

থেমে গেল মাঝপথেই। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ভদ্রলোক বললেন, কাশী বেড়াতে এসেছেন। কাশীর নানান বৈশিষ্ট্য নিশ্চয় লক্ষ্য করছেন। তাই আপনাকে জনান্তিকে জানাই—এই একটি বিষয়ে তামাম হিন্দুস্থানের মধ্যে কাশীর এই বিশ্বনাথের গলির বাজারের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীতে যত বাজার আছে সেখানকার আইন এই দঁড়িয়াঁ-কি-পোলের বাজারে চলে না।

: দড়িয়াঁ-কি-পোলটা কি?

: এইখানে শতখানেক বছর আগে একটা দড়ির সাঁকো ছিল। আজ যেটাকে আপনি আমি বিশ্বনাথের গলির মোড় বলি, শতখানেক বছর আগে তার অভিধা ছিল 'দড়িয়াঁ-কি-পোল'! এই বাজারে

সেল্‌সম্যানদের একটু নতুন ধরনের শিক্ষা নিতে হয়। তার প্রথম সূত্রটি হল : 'মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ, অর্থাৎ বাইরেটা দেখে তার ক্রয়ক্ষমতা বা আর্থিক সঙ্গতির বিচার কর না।' খোঁজ নিলে হয় তো দেখবেন—ঐ খাটোধুতি পরা বৃদ্ধটি হাইকোর্টের রিটায়ার্ড জজ, অথবা কর্মজীবনে ছিলেন টাটা-বিড়লার জোনাল ম্যানেজার। হয়তো ওঁর কলকাতায় আট-দশখানা বাড়ি, এক ছেলে হয়তো আমেরিকায় প্রফেসারি করছে, আর এক ছেলে ফিনান্স সেক্রেটারী !

টনির চোখ কপালে উঠে যায়। ভদ্রলোক তখনও বলছেন, ঠেকে শিখেছি কি না, নামাবলী গায়ে টিকি-সর্বস্ব বুড়ো বামুন অথবা সেমিজের উপর সাদা থান পরা মহিলা শাড়ি কিনে নিয়ে গেলেন, পরে শুনলাম—তিনি লালগোলার বা মুশণ্ডের প্রাক্তন মহারাজা অথবা বিহার গভর্নরের জননী ! এ শুধু কাশীর বাজারেই সম্ভব !

· ডাহিনে যাইব, ইয়া বাঁয়ে ?

রিক্সাওয়ালা গোধুলিয়ার মোড়ে পৌছে দ্বিধায় পড়েছে। টনি নির্দেশটা বাংলে দিয়ে বর্তমানে ফিরে আসে। সুরমার কথা মনে পড়ে। গাড়িতে ওঠার পর সে তো আর কোনও কথা বলেনি ? এটা বেগম বক্তিয়ার খিলিজির স্বভাববিরুদ্ধ। টনি নিঃশব্দে বেগমের হাতের উপর হাতখানা রাখে।

হোটেলে নির্দিষ্ট ঘরে পৌছে আবার এক নতুন হেঁয়ালি। ঘরে সবুজ নাইট-ল্যাম্প জ্বলছে। অর্থাৎ মা আর নিতুন ফিরে এসেছেন, কিন্তু এটা কে ? দরজার সামনে গামছা পেতে একটি ছেলে, বছর বারো-তেরোর একটি বিহারী ছোকরা শুয়ে আছে। ঠেলাঠেলি করতেই উঠে বসে ! টনি চিনতে পারে। পাণ্ডাজীর সেই ছেলেটা। মাকে নিয়ে যে গিয়েছিল দুর্গাবাড়ির দিকে। সন্ধ্যায় প্রোগ্রামটা ভাগাভাগি হয়ে যায়। সুরমা যাবে শাড়ি কিনতে, আর তার শাশুড়ী গোঁ ধরলেন—যাবেন দুর্গাবাড়ি, সঙ্কটমোচন। ৺বাবার ঠাঁঞ-য়ে এসে

দুর্গাবাড়ি দর্শন না করে গেলে সবই অসম্পূর্ণ। যেমন অসম্পূর্ণ সুরমার তরফে একখানা বেনারসী খরিদ না করলে। দু-নৌকোয়-পা-রাখা টনি চক্কোত্তি তাই বাধ্য হয়ে পার্টিশানে মত দিয়েছিল। স্বয়ং স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিল বেনারসী পটিতে ; আর পাণ্ডাজীর ঐ ছোকরার হেপাজতে নিতুন আর মাকে বিকেল-বিকেল রওনা করে দিয়েছিল রিক্সায় চাপিয়ে। দুর্গাবাড়ির দিকে।

ছোকরা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। দাঁড়ায়। চোখ রগড়িয়ে ঘুমটা তাড়ায়। তারপর নিঃশব্দে হাফপ্যান্টের পকেট থেকে বার করে দেয় একখণ্ড চিরকুট। পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল টনি।

সুরমা চিরকুটখানা পড়েনি। তবু শঙ্কার ছায়া পড়ে তার মুখে। মাতৃহৃদয়ের প্রথম প্রশ্নটাই দাখিল করে : নিতুন? নিতুন কই?

: ও কা বা?—দরজাটা খুলে পাণ্ডাজীর ছেলেটি দেখিয়ে দেয়, খাটের উপর নিতুন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। ছোকরা বুদ্ধি করে ওর জুতো জোড়াও খুলে নিয়েছে।

: মা? মা কোথায়?—জানতে চায় সুরমা।

পুনরুক্তি করে ছেলেটি : ও কা বা?—এবার তার তর্জনী নির্দেশ করছে টনি চক্কোত্তির হস্তধৃত কাগজখানা। টনি সেটা এবার বাড়িয়ে ধরে সুরমার দিকে। অস্ফুটে স্বগতোক্তি করে : এর মানে?

দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল সুরমা : "ছোট খোকা ও বৌমা।
আমার জন্য চিন্তা কর না। আজ রাত্রে আমি হোটেলে ফিরছি না। বিশেষ কারণে ঘনশ্যামদাস ধর্মশালায় রাত্রে থাকব। চকের কাছে যাকে জিজ্ঞাসা করবে সে-ই দেখিয়ে দেবে। কাল সকালে একবার বরং এস। কথা আছে। নিতুনকে ঘুম থেকে তুলে খাওয়াবার দরকার নেই। ও খেয়ে শুয়েছে। আশীর্বাদিকা মা।"

সমস্ত ভ্রমণ পথে এর চেয়ে বড় বিস্ময় নজরে পড়েনি টনির

অথবা তার ধর্মপত্নীর। নিতান্ত ছা-পোষা ইস্কুলমাস্টারের ঘরণী। একা-একা কস্মিনকালেও ঘোরা ফেরা করেননি। বাবা ছিলেন জেদী, খামখেয়ালী আর অদ্ভুত ধরনের ঝগড়াটে মানুষ। সজারুধর্মী। ঝগড়ার গন্ধ পেলেই গায়ের কাঁটাগুলো ফুলে উঠত। ফলে সারাজীবনে সাত আটবার চাকরি ছেড়েছেন, চাকরি ধরেছেন। বৃহত্তর বাঙলা-বিহারের বহু ইস্কুলে চাকরি করেছেন—রাজসাহী, পাটনা, কলকাতা, মুঙ্গের। মাকেও ঘুরতে হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তা বলে একা পথে বের হওয়ার অভিজ্ঞতা নেই বৃদ্ধার। যে কারণেই হোক—ছেলে ছেলেবৌ-এর এ নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে তাঁর পক্ষে ধর্মশালায় গিয়ে ওঠার কথা চিন্তাই করা যায় না। টাকা-কড়িও তাঁর কাছে বিশেষ কিছু নেই। কাশীতে—যতদূর জানে—এই তাঁর প্রথম আগমন। পথঘাট কিছুই চেনেন না। চকের মোড়ে ঘনশ্যামদাস ধর্মশালার কথা যে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে এ তথ্যটাও নিশ্চয় তাঁর সদ্য আহরিত। অর্থাৎ এমন কোন দলের সাক্ষাৎ পেয়েছেন দুর্গা-বাড়িতে—হয়তো তারাও এসেছে কাশী বেড়াতে—যারা ওঁকে প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। লেখাপড়া বেশীদূর করেননি, পনের বছর বয়সেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল, তবু মূর্খ তিনি নন। বুদ্ধিমতী। হয়তো উপলব্ধি করেছেন সুরমার মানসিকতা। বেটা-বেটাবৌ ওঁর সঙ্গে একত্রে রাত্রিবাস করছে আজ আটদিন। হয়তো সুযোগ পেয়ে তাদের একটু সুযোগ দিলেন। দুর্গাবাড়িতে যে দলটির সঙ্গে দেখা হয়েছে তারা টানাটানি করতেই রাজী হয়ে গেছেন। হয়তো সে দলের কোনও বর্ষীয়সী কৌতুকময়ী বলেই বসেছিলেন: এক রাতের জন্য ব্যাটা-ব্যাটাবৌকে ছেড়েই দাও না দিদি! তোমার ছেলে ব্যাটার কর্তব্য করেছে, মাকেও নিয়ে এসেছে তীর্থে। এবার তুমি মায়ের কর্তব্য কর; ছেলে যাতে তীর্থে পৌছায়—

মা হয়তো বান্ধবীকে মুখ ঝামটা দিয়ে থামিয়ে দিয়েছেন, তীর্থে এসেও তোমার আল্‌গা মুখে কিছুই বাধছে না দিদি?

: কি করব বল ভাই? আমাদেরও তো এককালে অমন অবস্থা হত?

: অব্ হম্ যাই?—আড়ামুড়ি ভেঙে ছেলেটি প্রশ্ন করে।

বাধা দিল সুরমা। বললে, মা তোদের কোথায় ছেড়ে দিল? দুর্গাবাড়িতে?

ছেলেটি বললে, না। রিক্সা করে তিনি এই হোটেলে এসেছিলেন। সন্ধ্যার পরেই। খোকনকে খাইয়ে শুইয়ে দিলেন, মশারি খাটিয়ে দিলেন। তারপর এই চিঠি লিখে ওকে পাহারায় বসিয়ে আবার রিক্সা নিয়ে চলে গেলেন।

তাজ্জব!

টনি বলে, তোরা যখন দুর্গাবাড়ি বা সঙ্কটমোচনে ঘুরছিলি তখন বুড়ি-মাইজী আর কোনও যাত্রী দলের সঙ্গে কথা-টথা বলছিলেন? মানে, চেনা লোকটোক···

ছেলেটি ভাবল অনেকক্ষণ। তেমন কিছু মনে করতে পারল না।

রাত গভীর হয়েছে। আজ শারদ পূর্ণিমা। পূজার ছুটি শেষ। কালই ফিরতে হবে কলকাতায়। সন্ধ্যার ট্রেনে। কলকাতায় নিশ্চয় এখনও ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেনি। কাশীতে তা নয়। জানলা বন্ধ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে টনি। পুবের আকাশে চাঁদ উঠেছে। কোজাগরীব পূর্ণ চন্দ্র। এক দৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। দূরাগত কোন মন্দিরে শয়নারতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে। কাশী নিস্তব্ধ হয়ে আসছে। জানলা দিয়ে যতগুলি বাড়ি দেখা যায় তাদের বাতি নিভেছে ইতিমধ্যেই। দু-একটা নিশাচর গাড়ি যাচ্ছে সামনের পথটা দিয়ে। হোটেলের বাগানে কি একটা মিষ্টি ফুলের গাছ আছে নিশ্চয়। হাসনুহানা? জুঁই? ঠিক চিনতে পারছে না। এলোমেলো হাওয়ায় গন্ধের এক-একটা ঝাপটা আসছে। সামনেই একটা সোনা-

ঝুরি গাছ। জ্যোৎস্নার র‍্যাপার গায়ে জড়িয়ে গাছটা তখন ঝিমুচ্ছে। টনি জানে, রোজই দেখছে, ভোর না হতেই গাছটা কলকণ্ঠে জেগে উঠবে শতশত পাখীর কাকলিতে। নিতুন পাশ ফিরল। সুরমা সেই যে শ্রীবিষ্টু বলে বাথরুমে ঢুকেছে, আর তার সাড়াশব্দ নেই। পর পর দুটো সিগারেট শেষ হয়ে গেল। গলাটা তেতো তেতো লাগছে। কী করছে এতক্ষণ সুরমা? একবার ভাবল দরজায় গিয়ে নক্ করে। তারপর সে চিন্তাটা ত্যাগ করল। আলস্যেই। আবার ভাবতে থাকে—কী হতে পারে? চার দেওয়ালের মধ্যে যাঁর জীবন কেটেছে, বাইরের দুনিয়ার সম্বন্ধে যাঁর ধারণাই নেই, তিনি কোন সাহসে এভাবে একখণ্ড চিরকুট রেখে দিয়ে হোটেলের নিরাপত্তা ছেড়ে ধর্মশালায় গিয়ে ওঠেন? কার ভরসায়? টাকা-পয়সা অবশ্য বিশেষ কিছু সঙ্গে নেই, বাবা চলে যাওয়ার পরে গহনাও কিছু পরেন না—না গলায়, না কানে। হাতে অবশ্য সেই সাবেক রুলি দুটি আছে। বয়সও ষাটের উপর। সেসব ভয় কিছু নেই। কিন্তু কে সেই লোক যার আকর্ষণে মা এই সিদ্ধান্ত নিল?

হঠাৎ বাথরুমের দরজাটা খুলে গেল। বেরিয়ে এল সুরমা!

: বল? কেমন মানিয়েছে?

ও হরি! এই জন্যেই এত দেরী! সবুর সইছিল না সুরমার। পাট ভেঙে বেনারসীখানা পরে এসেছে। নির্জন ঘরে একবার শাড়িটা পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে চায়। হয়তো ভেবেছে, পছন্দ না হলে আবার ভাঁজে ভাঁজে পাট করে কাল সকালে গিয়ে বদলে আনবে। সেই চন্দন রঙেরখানা, অথবা আকাশী। সুরমা এগিয়ে যায়। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। যেন ফ্যাসন প্যারেডের শো গার্ল! ঘুরে ফিরে নার্‌শিসাশী তন্ময়তায় দেখতে থাকে দর্পণের ভিতরের ঐ মেয়েটিকে। আঁচলটা একবার তোলে কাঁধের উপর, একবার গুটিয়ে আনে যৌবনের জয়স্তম্ভ বিকশিত করে।

অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে টনির দিকে ফিরে বলে, কী ? মশায়ের কি বাক হরে গেল ? কী দেখছ অমন করে ?

রিফ্লেক্স এ্যাক্‌শন। টনি হাসল। বললে, ভয় হয় বলতে। পাছে ভাব মিছে কথা বানিয়ে বলছি !

: মিছে কথা বানিয়ে অনেক বলেছ। সেজন্য পুরস্কারও কম পাওনি জীবনে। আজ না হয় একটা সত্যি কথাই বললে ? বল ?

: মনে হচ্ছে সোফিয়া লরেন বিশ বছর বয়স হারিয়ে ফেলেছে !

: থাক মশাই, থাক ! অতটা সইবে না।

টনি এবার উঠে যায় বাথরুমের দিকে। যাবার সময় বলে, তুমি শাড়িটা ততক্ষণ খুলে ফেল !

বাথরুমের কপাট বন্ধ করে মনে হল—আশ্চর্য ! কী কৃত্রিম এই জীবন ! ঘরে-বাইরে শুধু মিছে কথার বেসাতি ! মিথ্যে স্তোকবাক্য আজকাল কেমন অনায়াসে আপনিই এসে যায় জিহ্বাগ্রে। ভাবতে হয় না। অফিসে বস্‌ এবং বাড়িতে গৃহিণীর প্রতি চাটুকারিতা যেন সেকেণ্ড-নেচাব। সব সময়েই বিশেষণ পদগুলি সুপারলেটিভ। ওগুলো বলতে হয়, যে শোনে সে হয়তো বোঝে তার অন্তঃসারশূন্যতা—হয়তো বোঝে না, কিন্তু খুশী হয়। অফিসে বস্‌, বাড়িতে বউ।

কিন্তু !

মা কার দেখা পেল ? বেসিনের কলটা খুলে দিতেই হুড় হুড় করে জল নামল। আর ঠিক তখনই একটা চিন্তা বিদ্যুতচমকের মতো জেগে উঠল ওর মাথায় : তবে কি মা—?

বাথরুম থেকে যখন বেরিয়ে এল টনি তখন শয়নকক্ষের জোরালো বাতিটা নিবেছে। সবুজ নাইট-লাইটটা জ্বলছে। সাদা বেনারসীটা পিসবোর্ডের 'বাক্সে ঘুমচ্ছে। সাধারণ একটা লালপেড়ে মিলের শাড়ি পরে সুরমা শুয়ে পড়েছে। টাঙায়নি মশারিটা, বরং খুলে রেখেছে ব্লাউস-ব্রা। পাশের খাটে নিতুন ঘুমিয়ে কাদা। দেখলে মনে হয়

সুরমাও অঘোরে ঘুমচ্ছে। টনির ইচ্ছে করল একটা অট্টহাসে ফেটে পড়ে। তার নজরে পড়েছে ধাড়িমাগীর ন্যাবস্তানি :

ডবল-বেড-এর খাটে সুরমার মাথার নিচে একটা বালিশ এবং টনির বালিশটা তার পায়ের কাছে !

কোনও মানে হয় ?

টনির মনে পড়ল, সাত বছর আগেকার দিনগুলোর কথা। সদ্যবিবাহিত বধূকে বলেছিল : বেশ তো ! মুখে বলতে যদি এতই লজ্জা তাহলে এক কাজ কর—আমার বালিশটা পায়ের দিকে রেখে দিও। তাতেই বুঝে নেব আমি !

এরপর বহু রাত্রে দেখা গেছে টনির মাথার বালিশ স্থানচ্যুত। সে আজ ছ-সাত বছর আগের কথা। ইদানিংকালে ওর মাথার বালিশ পথভুলে কোনরাত্রে সুরমার পায়ে মাথা খুঁড়েছে বলে মনে করতে পারল না। আজ মা বিদায় হওয়ায় সাতদিনের উপোসী বালিশটা বোধহয় পথ ভুলেছে।

ঝুপ করে শুয়ে পড়ে টনি। টেনে নেয় কপট ঘুমে অচেতন একটি নারীদেহ। তার চোখ দুটো খুলে যায়। বলে, জুঁয়ের মালাটা তখন কিনতে দিলে না কেন ?

একই শহর। একই রাত্রি। এখানেও দ্বৈতশয্যা। শারদীয় কোজাগরী। তফাৎ শুধু এই—পূবের পূর্ণচাঁদ এতক্ষণে পশ্চিম আকাশে। পশ্চিম আকাশে কাশীর ক্লান্ত পাণ্ডুর চাঁদ ব্যাসকাশীর দিকে ঢলে পড়েছে।

এমন ব্রাহ্মমুহূর্তেই ঘুম ভাঙে সত্যবানের। আলো-আঁধারের মিলন-মুহূর্তে, ঋণাত্মক রাত্রি ধনাত্মক দিনে রূপান্তরিত হওয়ার ট্রানজিশান পয়েন্টে—এই উষালগ্নেই ওঁর চৈতন্য জাগরিত হয়। আজও হল। প্রথমটা চমকে ওঠেন। পরমুহূর্তেই সবকথা মনে পড়ে যায়। লক্ষ্য হয়, তাঁর বাম বাহুর উপর মাথা রেখে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছেন ওঁর পঁয়ষট্টি বছরের জীবন সঙ্গিনী। পরম যত্নে সত্যবান তাঁর মাথায়, কপালে হাত বুলিয়ে দেন। ঘুমটা ভেঙে যায়। চোখ খুলেই হেসে ফেলেন সাবিত্রী। হঠাৎ নববধূরমতো লজ্জা পান—মুখ লুকান স্বামীর বুকের পাঁজরে।

সত্যবান উঠে বসেন। চাদরটা সরে গিয়েছিল, টেনে দেন ওর গায়ের উপর। ভোর বেলা বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। সাবিত্রী বলেন, এখন সাত সকালে ওঠ? কী রাজকাযি্য পড়ে আছে তোমার? শুনি? এখানেও কি সকাল বেলা ছেলে ঠ্যাঙানোর কান্না নেওয়া আছে?

সত্যবান লজ্জা পেলেন: অভ্যাস! ঘুম ভেঙে গেলে আর শুয়ে থাকতে পারি না। তুমি ঘুমাও বরং।

দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে হয় না। সাবিত্রী পাশ ফিরে শোন।

কুলুঙ্গি থেকে একটা নিমের দাঁতন আর লোটাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সত্যবান।

ফিরে যখন এলেন, আধঘণ্টা পরে, তখন ভোরের আলো ফুটেছে—বুড়ো বটগাছটার ডালে-ডালে পাখ-পাখালির কিচিমিচি আবার শুরু হয়েছে। সত্যবান-পত্নী তখনও ঘুমচ্ছেন। কর্তার হাতে সেই নিমেব দাঁতন কাঠিটা নেই; তাব পবিবর্তে মাটির ভাঁড়ে এক ভাঁড় ধূমায়িত চা। ঘুমন্ত মানুষটাকে দেখে ইতস্তত করতে থাকেন—ডাকবেন না, না।

আপনিই ঘুম ভেঙে গেল সাবিত্রীর। আবার হাসলেন। বলেন কী দেখছ অমন করে?

হাসি সংক্রামক। সত্যবান বলেন, ভয় হয় বলতে। পাছে ভাব, মিছে কথা বলছি বানিয়ে—

: মিছে কথা বানিয়ে বলাব হিম্মৎই যে তোমার নেই তা আমার জানা। সেজন্য গঞ্জনাও তো বড় কম সইতে হয়নি সারা জীবনভর। আজ না হয় আমার মন-রাখা একটা মিছে কথাই বললে? বল?

: মনে হচ্ছে কোজাগরী পুর্ণিমা রাত্রে গৃহলক্ষ্মীকে ফিরে পেলাম। জানি, তুমি থাকবে না, থাকতে পাব না। তাতে কী? লক্ষ্মীর তো 'চঞ্চলা' বলে বদনাম আছেই!

এতক্ষণে লক্ষ্য হয় ভাঁড়টার দিকে। বললেন, তোমার হাতে ওটা কী?

: চা। বিশু পাঁড়ের দোকান থেকে নিয়ে এলাম। তুমি তো ভোরে এক কাপ চা খেতে!

: খেতাম। আজকাল আর খাই না।…না না, আজ খাব, দাও।

তারিয়ে তারিয়ে ভাঁড়ের চা-টুকু খেলেন বিছানাতে বসে। এখনও সূর্যোদয় হয়নি। না হলে, জপ-তপের আগে নিশ্চয় চা খেতেন না। উঠলেন বিছানা ছেড়ে। জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভাঁড়টা জানলা গলিয়ে ফেলে দিলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার হাসলেন।

বললেন, কী আশ্চর্য! এখনও তাকিয়ে বসে আছ? পঞ্চাশ বছর ধরে দেখছ তো তোমার লক্ষ্মীঠাকরুনটিকে, তবু—

বাধা দিয়ে সত্যবান বলেন, না, পঞ্চাশ নয়, চুয়াল্লিশ। উনপঞ্চাশ বছরের বিবাহিত জীবন থেকে গত পাঁচ বছর বাদ।

: তা ঠিক। হিসাবের ভুল হবে না তোমার!

: কেমন করে হবে সাবি? আমি যে অঙ্কের মাস্টার! ঐ হিসাব-টুকুই তো বুঝি।

সাবিত্রী বলেন, তোমার এ-বাড়িতে রান্নাঘর কোথায়, স্নানঘর কোথায়? সব দেখিয়ে দাও আমাকে। কাল অত রাতে তো কিছুই দেখিনি।

: এ-বাড়িতে আমি থাকি না সাবি। এটা ছগনলালের ডেরা। ছগনলাল এই ধর্মশালার দারোয়ান। সে দেশে গেছে—তাই তার মালপত্র যাতে চুরি না যায় তাই আমি পাহারা দিতে এখানে থাকি। রান্নাঘর একটা আছে, হয়তো অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িকুড়িও আছে, তবে বাথরুম নেই। সেটা তোমাকে ঐ ধর্মশালাতে গিয়েই সারতে হবে।

: তা না হয় সারলাম; কিন্তু হাঁড়িকুড়ি আদৌ আছে কিনা তা তুমি জান না, এটা কেমন কথা? তুমি তো স্বপাক খাও!

: না, না। দিনের বেলা দুর্গাবাড়িতে অতিথি-নারায়ণের সেবার ব্যবস্থা আছে, রাতে আর কিছু খাই না।

চলতে শুরু করেছিলেন সাবিত্রী। থমকে থেমে পড়ে বলেন, এ-ভাবেই কেটেছে পাঁচ-পাঁচটা বছর?

এবার ম্লান হাসলেন সত্যবান। বললেন, তুমি তো জান সাবি, মন-রাখা দুটো কথা বানিয়ে বলার ক্ষমতা আমার নেই। সুতরাং পাঁচ বছর কি ভাবে কেটেছে তা আর জানতে চেও না।

সাবিত্রীর নয়ন নত হয়। হয়তো গত পাঁচ বছর তিনি নিজে কী ভাবে থেকেছেন, কী খেয়েছেন তাই খতিয়ে দেখছিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস

পড়ল তাঁর। জানতে চাইলেন, ছগনলালের বাসনপত্রে রান্না করা যাবে কিনা। নিশ্চয় যাবে। সে বন্ধু লোক। নিরামিষাশী। সাবিত্রী মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন, সত্যবান তা জানেন। তিনি তা সত্ত্বেও অনুমোদন করলেন সাবিত্রী ঐ ছগনলাল পাঁড়েজীর ঝকঝকে-করে মাজা বাসনে রান্না করতে পারেন। ওর পাত্রে আহার করতে পারেন।

: তাহলে তুমি বাজারে যাও। চাল-ডাল-তেল-নুন সব কিছুই লাগবে মনে হচ্ছে। আর যদি মাছ পাও—

আবার ম্লান হয়ে গেলেন সত্যবান। সাবিত্রী বলেন, বুঝেছি। সে তোমাকে ভাবতে হবে না।

আঁচল থেকে খুলে একটি দশ টাকার নোট বার করে দেন। বলেন, তুমি বাজারটা সেরে এস, আমি চান-টান করে পুজোটা সেরে রাখি। ভাল কথা, রান্না নামতে তো বেলা হবে। সকালে তুমি কী খাও?

আবার সেই অপ্রতিভের হাসি। বুঝতে পারেন সাবিত্রী। হাসি শুধু সংক্রামক নয়, তা বুমেরাঙধর্মী। সাবিত্রী তাই আবার বলেন, বুঝেছি। দেখ না, পানফলের জিলাপী পাওয়া যায় কিনা। শুনেছি কাশীতে পাওয়া যায়—

বেলা দ্বিপ্রহর। সত্যবান গঙ্গাস্নান সেরে এসেছেন। সাবিত্রী অবশ্য ধর্মশালার বাথরুমেই আজ সেরেছেন। না হলে রান্নার দেরী হয়ে যাবে। রান্নাও প্রায় শেষ। পাত্রের অভাব, না হলে সাবিত্রী আজ পঞ্চ-ব্যঞ্জন রাঁধতেন। কিন্তু ছগনলালের ঘরে একটি ডেকচি, একটি কড়াই। না, মাছ আনেননি সত্যবান। ছগনলালের বাসনপত্রে মাছ-মাংস রান্না করা উচিত হবে না। ফুলকপি উঠেছে কাশীর বাজারে, কড়াইশুঁটি টম্যাটোও পাওয়া গেছে। ভাত ডাল আর ফুলকপির ঝোল। সত্যবান বুদ্ধি করে একটু দইও নিয়ে এসেছেন।

ছগনলালের ঘরটি ছোট, খুবই ছোট। একা মানুষের পক্ষে তাই

যথেষ্ট। বিছানাটা গুটিয়ে ঠাঁই করলেন সাবিত্রী। বললেন, একটাই থালা আছে। তুমি খেয়ে নাও, তারপর ঐ পাতেই আমি খেয়ে নেব।

সত্যবান আহাবাদি সারলেন—অনেক, অনেক দিন পরে তৃপ্তি করে খেলেন। স্ত্রীর হাতের রান্না। পাঁচ বছর পরে। সাবিত্রী কিন্তু একাগ্র মনে স্বামীকে বসিয়ে খাওয়াতে পারলেন না। সামনেই বসেছিলেন তিনি তালপাখা হাতে, আগে যেমন বসতেন। মাছি তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন পাখার সঞ্চালনে। কিন্তু তাঁর মন পড়ে ছিল সদব দবজার দিকে। ধর্মশালার একান্তে দরোয়ানের এই ছোট খুপরি। এখানে বসেই ধর্মশালার লোহার গেটটা দেখা যায়। সাবিত্রীব প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল—এখনই ওখানে এসে দাঁড়াবে একটা সাইকেল রিক্‌শা। নেমে আসবে টনি-সুরমা-নিতুন। আসবেই। তিনি অবশ্য চিঠিতে উল্লেখ করেননি কেন, কী মর্মান্তিক প্রয়োজনে তিনি কাল রাত্রে হোটেল ছেড়ে এখানে এসে উঠেছেন। ইচ্ছে করেই উল্লেখ করেননি। কিছুটা সঙ্কোচ, কিছুটা শঙ্কা। ভেবেছিলেন, ছোটখোকা বুঝে নেবে। উনি যে কাশীতেই আছেন এটা সাবিত্রীর জানা ছিল না, ছোটখোকা হয়তো জানত। বুঝুক না বুঝুক, ওরা আজ সকালে খোঁজ নিতে আসবেই। বিদেশ-বিভুঁয়ে এমনভাবে হঠাৎ ঘরছাড়া বুড়ি মানুষটার খোঁজ নিতে ছুটে আসবে সকাল না হতেই। বস্তুত হয়তো সেই জন্যেই চিঠিতে সত্যবানের হঠাৎ সাক্ষাৎ পাওয়ার কথাটা অনুল্লেখ রেখেছেন। সাবিত্রী জানতেন—দু'পক্ষের মনেই ঘনীভূত হয়েছিল দুরন্ত অভিমান। সে আজ পাঁচ বছর আগেকার কথা। এই পাঁচ-পাঁচটা বছরে সে অভিমান কতটা দ্রব হয়েছে তা অবশ্য জানা ছিল না। অমৃত ব্যানার্জি রোডের সেই দ্বিতল বাড়িতে এই পাঁচ বছরে সত্যবান চক্রবর্তীর নাম আদৌ উচ্চারিত হয়নি—তিনি কোথায় আছেন, কি ভাবে আছেন, আদৌ বেঁচে আছেন কি না, এ প্রশ্নও কেউ কোনদিন তোলেনি। তাই গতকাল সন্ধ্যায় চিঠিতে তিনি সে-কথার উল্লেখ করেননি। ভেবেছিলেন—ছোটখোকা যদি আন্দাজ করতে না পারে

তাহলে দুরন্ত কৌতূহলে, আতঙ্কিত হয়ে সে ছুটে আসবে কাক-ডাকা ভোরে, মায়ের সন্ধান নিতে। তখন মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে ওদের দুজনকে—পিতাপুত্র। সাবিত্রী তখন কী ভাবে মহড়া নেবেন সেটাও ভেবে রেখেছিলেন। আর যদি ছোটখোকা আন্দাজ করতে পারে, যদি ইতিমধ্যে সেই অভিমানের কঠিন বরফ অলক্ষিতে গলে গিয়ে থাকে, তাহলেও টনি এসে দাঁড়াবে—চক্ষুলজ্জাকে বুঝ দিয়ে : আমি বুঝতেই পারিনি যে, তুমি বাবার দেখা পেয়েছ।

আশঙ্কা ছিল সাবিত্রীর—বৃদ্ধ বুভুক্ষুর আহারপর্ব শেষ না হতেই যদি ওরা এসে পড়ে !

এল না। ধীরেসুস্থে আহারাদি সেরে সত্যবান আসন ত্যাগ করলেন। ছগনলালের লোটায় জল ভরা ছিল, মুখ ধুয়ে ফিরে এসে বসলেন চারপাইতে। কুলুঙ্গির একটা কৌটো থেকে একখণ্ড হরিতকী নিয়ে মুখে পুরলেন। ধূমপানে অভ্যস্ত নন সত্যবান মাস্টার। অদূরে কোথাও পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজার ঘণ্টা পড়ল। সাবিত্রী এবার সত্যবানের এঁটো পাতে ভাত বেড়ে নেবার উপক্রম করছিলেন। ঠিক তখনই এল সেই ছোকরা। সাবিত্রীই দেখতে পেলেন প্রথমে। ঘুম নয়, দিনে ঘুমোন না সত্যবান—'দিবা মা শাপ্সি'—চোখের উপর হাতটা রেখে আলো আড়াল করে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সন্তর্পণে এঁটো হাত ধুয়ে বকের মত পা ফেলে এগিয়ে এলেন বৃদ্ধা। ছেলেটি নিঃশব্দে প্যান্টের পকেট থেকে একটি চিরকুট বার করে দিল।

এমন একটা আশঙ্কাও ছিল। দুরন্ত অভিমানী ছোটখোকা। আর তাছাড়া সে তো একলা নয়। ঘর-জ্বালানী পরের মেয়েটি যে আঠার মত সেঁটে আছেন। এ নিশ্চয় তারই নির্দেশে।

"শ্রীচরণকমলেষু মা—তোমার ব্যবহারে রীতিমত বিস্মিত হয়েছি। নিতুনকে ওভাবে একা ঘরে ফেলে রেখে তুমি যে হঠাৎ কেন ধর্মশালায় গিয়ে উঠলে তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। নিশ্চয়ই পরিচিত এবং বিশ্বাসভাজন কারও সাক্ষাৎ পেয়েছিলে।

সে-ক্ষেত্রে আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই ভাল করতে। সে যাই হোক, আজ সন্ধ্যা সাতটার ট্রেনে তোমার টিকিট কাটা আছে এ কথা নিশ্চয়ই ভোলনি। এই ছেলেটির হাতে টিকিট ও রিজার্ভেশন পাঠিয়ে দিলাম। এর সঙ্গে যদি ফিরে আস তাহলে তো ভালই। নচেৎ সরাসরি স্টেশনেও যেতে পার। তোমার মালপত্র আমরা বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে স্টেশনে যাব। ইতি টনি!"

—তুই আমার পেটে জন্মেছিস, না আমি তোর পেটে? মাথামুণ্ডু কিছুই যদি না বুঝতিস্ ছোটখোকা, তাহলে রাত ভোর হবার তর সইত না। বুঝেছিস! ঠিকই বুঝেছিস, আর তাই লিখতে পেরেছিস—'নচেৎ সরাসরি স্টেশনেও যেতে পার'। কারণ তুই জানিস্ যে, আমি সরাসরি স্টেশনে নাও যেতে পারি। এখানেই থেকে যেতে পারি! তার মানে এমন একজন মানুষের সন্ধান আমি পেয়েছি যাঁর কাছে বাকি জীবনটা আমি কাশীতেই কাটিয়ে দিতে পারি! তাহলে তোদের ভারি সুবিধা হয়, না? একেবারে ঝাড়া-হাত-পা! বাপ অন্নধ্বংস করে না, মা-ও বিদায় হল। কত সুবিধে! এরপর বাড়িতে বসেই সন্ধ্যাবেলা মদ খেতে পারবি, হেঁসেলে মুরগী ঢুকবে, তোর বো নিশ্চিন্ত মনে বেলেল্লাপানা করবে—আর ভয়-ডর করবি কাকে? কিন্তু ছোটখোকা—আমি তোর পণ্ডিত বাপ নই, আমি তোর মূর্খ মা। তাই ও ভুল আমি করব না। আমি ফিরব তোদের সঙ্গেই। অত সহজে আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। আমার পাওনা-গণ্ডা ·

: ক্যা মাইজী? আপ যাইব? রিক্শা বোলাই?—পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিতাকে প্রশ্ন করে ছেলেটি। সাবিত্রীর স্বগতোক্তি বন্ধ হয়। মনে মনে যে সম্ভাষণ করছিলেন পুত্রকে সেটিতে ছেদ পড়ে। ছেলেটিকে অপেক্ষা করতে বলে ফিরে আসেন ঘরে।

: কিছু খুঁজছ?—প্রশ্ন করেন সত্যবান মাস্টার। চোখ খুলেছেন তিনি।

: হ্যাঁ। একটা কলম আর কাগজ।

: কলম নেই, পেন্সিল আছে। কাগজই বা কোথায় পাই? তা ইয়ে···ছোটখোকার চিঠির পিছন দিকে জায়গা নেই লেখার?

আশ্চর্য মানুষ!

জবাবে জানালেন, তিনি কোথায় কার কাছে আছেন। আরও লিখলেন, ছোটখোকার উচিত এখানে একবার আসা। বাপকে অর্থ-সাহায্য করুক না-করুক—তিনি হয়তো সেটা গ্রহণেও অস্বীকৃত হবেন—হবেন কিনা জানেন না সাবিত্রী—এ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করার সাহস তাঁর নেই—একবার তার জেনে যাওয়া উচিত, দেখে যাওয়া উচিত তার নির্বাসিত পিতা কী-ভাবে শেষ-জীবন যাপন করছেন। যে কারণে এই কঠিন দণ্ড ভোগ করছেন বৃদ্ধ সেই কারণটা আজ নেই, তার সব কিছু চুকে-বুকে গেছে। সুতরাং সাবিত্রী আশা করবেন তাঁর পুত্র তার মায়ের মর্যাদা রাখতে এখানে এসে তাঁকে নিয়ে যাবে।

চিঠিখানা শেষ করে তিনি সেটা বাড়িয়ে ধরেন স্বামীর দিকে। বলেন, কাল জানিয়ে আসিনি তোমার দেখা পেয়েছি। সকালে ওদের এখানে আসতে বলেছিলাম। পড়ে দেখ, খোকার চিঠি আর আমার জবাব।

সত্যবান হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিলেন। পড়লেন না। ভাঁজ করা চিঠিখানা প্রতীক্ষারত পাণ্ডাজীর পুত্রের হাতে দিয়ে বললেন, বহু বাবুকে দে দেনা।

ছেলেটি চলে যেতেই সাবিত্রীর দিকে ফিরে বললেন, আজকের দিনটা বড় আনন্দের সাবিত্রী। এটাকে কোনমতেই তিক্ত হতে দেব না। তোমার তো আজই সন্ধ্যার গাড়িতে ফেরার টিকিট কাটা আছে, নয়?

দাঁতে দাঁত চেপে অভিমানিনী সাবিত্রী বলেন, তুমি আমায় চলে যেতে বলছ? তাড়িয়ে দিচ্ছ?

হেসে ওঠেন সত্যবান : কী পাগলের মত কথা ! এটা যে কাশীধাম ! এখান থেকে কেউ কারুকে তাড়াতে পারে ? তবে হ্যাঁ, পবামর্শ যদি চাও, তবে আমি তোমাকে ওর সঙ্গে যেতেই বলব।

: কেন ? তুমি আমাকে দু-মুঠো খেতে দিতে পার না ! আমি না তোমার স্ত্রী ?

. পারি। যদি তুমি 'স্ত্রী' শব্দটি বদলিয়ে বলতে পার . 'আমি না তোমাব সহধর্মিণী ?'

এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সাবিত্রী। তারপর বলেন, কিন্তু তা যে হবার নয়। তুমিও জানো সে-কথা। পঞ্চাশ বছরেব চেষ্টাতেও পারিনি। তোমার ধর্ম আর আমার ধর্ম এক নয়, এক হতে পারেনি, পারবে না। তুমি সংসারে উদাসীন, আঁকড়ে আছ নীরস অঙ্কশাস্ত্র ; আমি সংসারসমুদ্রে ডুবে আছি মাছের মত, অঙ্ক আদৌ বুঝি না। তুমি ঠাকুর-দেবতা বিশ্বাস কর না, বাছ-বিচার নেই, জাত-অজাত, খাদ্যাখাদ্য মানো না—আমি আছি আমার গোপাল নিয়ে, জপ-তপ বিধি-নিষেধ নিয়ে। তাই কোনদিনই পারব না তোমার সহধর্মিণী হতে। কিন্তু আমি তোমার স্ত্রীও তো বটে। সে দায়-দায়িত্ব তুমি কেমন করে অস্বীকার করবে ?

: অস্বীকার তো আমি করিনি সাবিত্রী। সংসারের বোঝা টেনে এসেছি সারা জীবন—মানুষ করেছি ছেলেমেয়েদের। একদিন তুমি এ পরিবারে এসেছিলে সত্যবান মাস্টারের 'স্ত্রী'র পরিচয়ে ; আজ তোমার পরিচয় নিউটন চক্রবর্তীর 'মা'। ঐ নিউটন চক্রবর্তীকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তার হাতেই তুলে দিয়েছি তোমাকে। দায়িত্ব তো আমি অস্বীকার করিনি, সাবি !

: মানুষ করেছ ? ঠিক জান ?

এবার একটু কঠিন শোনালো সত্যবানের কণ্ঠস্বর : এ প্রশ্ন আজ কেন জিজ্ঞাসা করছ সাবিত্রী ? পাঁচ বছর আগেকার সেই দিনটির কথা মনে করে দেখ। যেদিন এ নিয়ে মতবিরোধ হয়েছিল

তোমার স্বামী এবং তোমার সন্তানের মধ্যে। সেদিন তুমি, হ্যাঁ, তুমি কী রায় দিয়েছিলে? সন্তানের মধ্যেই তুমি একটা গোটা মানুষ দেখতে পেয়েছিলে, স্বামীকে মনে হয়েছিল অমানুষ। সে দ্বৈরথ সমরে তুমি ও-পক্ষেই যোগদান করেছিলে। সন্তানকে বলেছিলে—'বেছে নাও, হয় বাবা নয় মা, একজনকে বিদায় দিতে হবে তোমাকে। এক ছাদের নিচে আমরা থাকতে পারব না এর পর।' সুতরাং আজ আমি কী কৈফিয়ত দেব! ছোটখোকাকে 'মানুষ' করতে পেরেছি কিনা এ কৈফিয়ত কি তুমিই দাবী করতে পার?

মুখটা নিচু করলেন সাবিত্রী। ঝর ঝর করে চোখের জল ঝরে পড়ল। এ অভিযোগ অস্বীকার করতে পারেন না। সত্যবান মিছে কথা বলেননি। বলেন না।

আঁচলে মুখটা মুছে নিয়ে বললেন, আজকের দিনটা আমারও আনন্দের গো। পুরনো কথা আজ আর তুলো না। কিন্তু এর পর তোমাকে এ-ভাবে ফেলে রেখে যেতে পারব না। ছেলের রোজগারে থাকার সখ আমার মিটেছে। তুমি আমাকে ঠাঁই দাও। আমি বাবা বিশ্বনাথের চরণেই—

: তার মানে আজ তুমি যাচ্ছ না? সে-কথাই লিখে দিয়েছ তাহলে?

: না। আমি তো তোমার মত পণ্ডিত নই। আমি মূর্খ। দুনিয়াদারি বুঝি। আমি আজ ওদের সঙ্গেই ফিরে যাব। আমার বিয়ের গয়না এখনও বেশ কিছু আছে। অতুর বিয়েতে কিছু ভেঙেছি, আর্মলেট-জোড়া দিয়ে মুখ দেখেছি বৌমার। তবু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আজও যা আছে তা দশ ভরি হবে। কলকাতায় গিয়ে সব বেচে দেব। বুড়ো-বুড়ির বাকি জীবনের কাশীবাসের পক্ষে ও টাকা যথেষ্ট। তুমিও প্রাইভেট টুইশানি করে—এখন আর কর না, নয়?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সত্যবান বলেন, অত টাকা কি পেট-কোঁচড়ে নিয়ে আসবে? শেষে গাড়িতেই—

: না! হুণ্ডি করে আনব, ঐ যে 'ট্রাভ্‌লার্স-চেক' না কী বলে যেন?

সত্যবান রীতিমত অবাক হলেন। পাঁচ বছর আগে যে ষাট বছরের সীমন্তিনীকে কালীঘাটের বাসায় রেখে দেশত্যাগ করেন, এ বৃদ্ধা তার চেয়ে অনেক সেয়ানা। ঠেকে শিখেছেন বোধকরি, পুত্রের সংসারে। উনি যে মহিলাটিকে চিনতেন তার মুখে 'ট্রাভ্‌লার্স-চেক' কথাটা প্রত্যাশার বাইরে।

সাবিত্রী আহারে বসেছেন। সত্যবান চারপাইয়ে আধশোয়া। সাবিত্রীই পুনরায় বলেন, এ ডেরায় তো বললে মাস খানেক আগে এসেছ। তার আগে কোথায় থাকতে? সে ঘরখানা আছে? তাহলে মাস খানেক পবে ফিরে এসে সেখানেই উঠব, কি বল?

জলের ঘটিটা শেষ হয়েছিল। সত্যবান উঠলেন, জল গড়িয়ে আবার ঘটিটা ওঁব কাছে নামিয়ে দিয়ে বললেন, সেখানে তোমার থাকা সম্ভবপর নয়। ইতিমধ্যে অন্য বাসা খুঁজে নেব।

: কেন সম্ভব নয়? তুমি কি ভাব, আমি তোমার মত কষ্টসহিষ্ণু নই? তুমি যদি থাকতে পেরে থাক, তাহলে আমিও পারব।

: সেজন্য নয়, সাবি। জায়গাটা খারাপ। তোমার থাকবার উপযুক্ত নয়।

: খারাপ? বস্তী? কেন খারাপ?

: সেটা একটা বেশ্যাপল্লী!

বিষম খেলেন সাবিত্রী। সামলে নিয়ে বলেন, খুলে বল দেখি এ পাঁচ বছরের কথা?

: বলব। তোমার খাওয়া হয়ে যাক।

আহারান্তে সে কাহিনী শোনালেন। এবার সাবিত্রী শুয়েছেন চারপাইতে। সত্যবান বসে আছেন মাটিতে, একটা কম্বলের আসন টেনে নিয়ে। বিস্তারিত শোনালেন না সব কথা। সংক্ষেপে বিবৃত

করলেন পাঁচ বছরের ইতিহাস :

নির্বাসনদণ্ড হয়েছিল তাঁর। মেনে নিয়েছিলেন নতমস্তকে। বিদায়-মুহূর্তে স্ত্রী রইলেন অন্তরালে। আসন্নপ্রসবা পুত্রবধূ রইল মুখ ঘুরিয়ে। পুত্র নির্দয়ভাবে বললে, তোমাব বইপত্রগুলো নিয়ে যেতে পার।

: থাক। ওগুলো আর কোন কাজে লাগবে ?

: তবে থাক। ট্যাক্সি এসেছে। শরৎ তোমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে।

ট্রেনেই যে যাবেন এ কথা বলেননি সত্যবান। কোথায় যাবেন তাও অনুচ্চারিত আছে। এ বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে, এটুকুই স্থির হয়েছিল। বোধকরি টনি চক্কোত্তির ধারণা—এ অবস্থায় বাসে বা নৌকোয় যথেষ্ট দূরে যাওয়া যায় না। সত্যবান মাস্টার ট্রেনে করেই যাবেন।

ট্যাক্সিতে উঠে শরৎ বলেছিল. আমরা কোথায় যাচ্ছি তাঐমশাই, শেয়ালদা, না হাওড়া।

সত্যবান জবাব দিলেন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে : হাওড়া স্টেশন।

ট্যাক্সিতে আর কোন কথা হয়নি। শরৎ উশখুশ করছিল। কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। মাত্র বছর-খানেকের পরিচয়। কুটুম। অথচ এই অপ্রিয় কর্তব্যটা তাকেই করতে হচ্ছে। উপায় নেই। সে ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছে এ ব্যাপারে। সনতের শ্বশুর বলেই শুধু নন, ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হিমালয়াস্তিক মূর্খামি তাকে একটা চরম বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে—আর সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে, এজন্য বেচারি প্রাণখুলে কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করতে পারছে না।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে পুনরায় তাকে প্রশ্ন করতে হয়েছিল, আপনাকে কোথাকার টিকিট কেটে দেব ?

এ-কথা আগে থেকে ভেবে রাখেননি। কি জানি কেন মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল : কাশী !

বোধকরি 'বার্ধক্যে বারাণসী' উদ্ভট-শ্লোকের উদয় হয়েছিল ওঁর মনে।

থার্ড নয়, সেকেণ্ড ক্লাসের একখানা টিকিট কেটে দিয়েছিল শরৎ। ওঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ইতস্তত করে বলেছিল, একটা পৌছানো সংবাদ দেবেন, আর কোথায় থাকছেন সে ঠিকানাটা—

বাধা দিয়ে সত্যবান বলেছিলেন, কাকে জানাবো শরৎ? সে সংবাদের জন্য কে অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করবে?

সামলে নিয়ে শরৎ বলেছিল, আর কেউ যদি অধীর না হয়, আমি হব তাঐমশাই। আমি কৃতঘ্ন নই। আপনি আমার যে উপকার করেছেন তা আমি ভুলতে পারি না। আপনি যাতে অর্থ-কষ্টে···

: থামো! শেষ মুহূর্তে আমাকে কটু কথা বলতে বাধ্য করো না। শরৎ, তোমার কি ধারণা তোমার জেল-জরিমানা ঠেকাতে আমি এ মূর্খামি করেছি?

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যায় শরৎ মুখার্জি। সসঙ্কোচে বলে তবু ওঁরা দায়িত্বটা তো আমাকেই দিয়েছেন। ফিরে গিয়ে আমি মাঐমাকে কি বলব? টনিবাবুকে কি কৈফিয়ত দেব?

: বলবে—"সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ/সংযোগ বিপ্রয়োগান্তামরণান্তং তু জীবিতম্॥"

অর্থবোধ হয়নি শরতের। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বেচারি।···

অর্থগ্রহণ হয়নি সাবিত্রীরও। সত্যবানকে থামিয়ে বলেন, আমিও বুঝতে পারলাম না বাপু। সংস্কৃত শ্লোকটার মানে কি?

সত্যবান বললেন, সীতাকে নির্বাসনে পৌছে দিয়ে লক্ষ্মণও এ-জাতীয় প্রশ্ন করেছিলেন ভ্রাতৃজায়াকে। সীতা তখন দেবর লক্ষ্মণকে যে কৈফিয়ত দিয়েছিলেন, রাজধানীতে ফিরে এসে লক্ষ্মণ সে-কথাই বলেছিলেন শ্রীরামচন্দ্রকে। ঐ শ্লোকটার অর্থ—'সব সঞ্চয়ই পরিশেষে

ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, উন্নতিব শেষে আসে অবনতি, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ। জীবনের অনিবার্য পরিণাম মৃত্যু।'

: বুঝলাম। তারপর ?

আবার শুরু করেন সত্যবান। প্রথম মাস ছয় কাশীতে খুবই কষ্টে কেটেছে। পরিচিত কেউই ছিল না। ভেসে ভেসে বেরিয়েছেন। একটি কপর্দক সঙ্গে নেই। পরিধেয় বস্ত্র জীর্ণ হয়ে গেলে দ্বিতীয় বস্ত্র কেনার সঙ্গতি নেই। জীবনধারণ করেছেন বস্তুত দানছত্রের কল্যাণে। কারণটা খোলাখুলি বললেন না—কী জানি কেন অধীতবিদ্যার সাহায্যে জীবনধারণের চেষ্টা তিনি করেননি। ছেলে পড়িয়ে অনায়াসে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারতেন। তিনি অনার্স গ্র্যাজুয়েট। অঙ্কশাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার। কিন্তু প্রাইভেট টুইশানির চেষ্টা আদৌ করেননি। কেন ? কার উপর অভিমান ? না কি জীবনেই অনীহা ? সে কথা খোলাখুলি বললেন না সত্যবান মাস্টার। সাহস করে জানতেও চাইলেন না সাবিত্রী। উনি শুধু বললেন,—তারপরে ঐ তুলসীমানস-মন্দিরে অর্থোপার্জনের পথটা খুঁজে পাই। যা রোজগার হত, একটা পেট তাতেই চলে যেত। শীত ও বর্ষাকালে দুর্গাবাড়ির মন্দির চাতালে উঠে যেতাম, অন্যসময়ে ফুটপাতেই। এমনি সময়ে একদিন এক কাণ্ড হল :

তুলসীমানস-মন্দিরের সামনে বসে আছেন সত্যবান চক্রবর্তী। হঠাৎ ওঁর সামনে এসে দাঁড়ালো একটি তরুণী। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স। সুন্দরী নয়, স্বাস্থ্যবতী। সর্বাঙ্গে একটু বাড়াবাড়ি ধরনের সজ্জা। সীমন্তে সিঁদুর, চোখে কাজল, ঠোঁটে গালে রঙ। সঙ্গে একটি সুবেশ মাঝবয়সী লোক—হাতে দামী ঘড়ি ও আংটি, হীরের বোতাম। বাবা হলে বয়সের ফারাকটা কম, স্বামী হলে বেশী। মেয়েটি ওঁর চোখে চোখ রেখে বললে, মাফ কিজিয়ে, ক্যা আপ্ প্যারাবোলা-স্যার হ্যাঁয় ?

বৃদ্ধ মুখ তুলে অবাক বিস্ময়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

শতাব্দীর একপাদকাল এ পরিচয় হারিয়ে গেছে। নামটা যে ওঁরই সেকথা মনে করতে সময় লাগল। তারপর হেসে বললেন, হ্যাঁ মা। কিন্তু তোমাকে তো আমি চিনতে পারছি না ?

মেয়েটি চোস্ত-হিন্দীতে বললে, আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না। আপনি যখন আমাকে দেখেছেন তখনও আমি ফ্রক পরি। আমার বড়দাদা আপনার ছাত্র ছিলেন। তাঁর কাছে আপনার অনেক —অনেক গল্প শুনেছি। আপনাকে বহুবার দেখেওছি। তাই আজ দেখেই চিনতে পারলাম।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করেন, তোমার দাদার নাম কি ? কোন ইয়ারে ম্যাট্রিক দেয় ?

ওর সঙ্গী বোধহয় এ খেজুরে-আলাপে বিরক্ত হচ্ছিল। হাত ধরে আকর্ষণ করে। মেয়েটি বলে, ক্যা কল্ ইস্‌বক্ত ইহা আপ্‌সে ভেট হো সকৃতা ?

: হ্যাঁ। কাল এ-সময় আমি এখানেই থাকব। এস, কথা হবে।

মেয়েটি ওঁর পদধূলি নিয়ে সঙ্গীর হাত ধরে চলে গেল। টাঙ্গায় গিয়ে উঠল।

পরদিন সে আবার এল। এবার একা। আজ কোন সাজসজ্জা করেনি। লালপাড় সাদা শাড়ি, দু হাতে দু-গাছি কাঁচের চুড়ি। চোখে নেই কাজল, ঠোঁটে-গালে নেই অরুণাভা, আর আশ্চর্য! ওর সীমন্ত সাদা! চমকে উঠেছিলেন বৃদ্ধ। মেয়েটি কি রাতারাতি বিধবা হল! তাহলে কি আজ সে এ-ভাবে কথা রাখতে আসত ?

না। পিয়ারীবাঈ গতরাত্রে বিধবা হয়নি। সে খুলে বলেছিল তার সব কথা। সে রূপোপজীবিনী! দেহ নিয়ে তার বেসাতি। সে সধবাও নয়, বিধবাও নয়—বহুচারিণী! বৃদ্ধের সামনে মাটিতে বসে বলেছিল —বড়দাদা বলতেন, আপনি জাত মানেন না, ব্রাহ্মণ হয়েও জল-অচলের হাতে অন্নগ্রহণ করতেন। আপনি বলতেন—মুচি পেটের ধান্ধায় জুতো সেলাই করে, মেথর সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে ময়লা

ঘাঁটে। ওরা শুধু উপার্জনের জন্যই ঐসব কাজ করে বটে, কিন্তু সমাজে তারা অপরিহার্য। ওরা সমাজ-সেবাই করছে। বলতেন না!

বুদ্ধ বলেছিলেন, বলতাম। আজও বলি।

: তাহলে বলুন, আমরা, আমি যে কাজ করছি সেটার জন্য কি আমাদের ঘৃণা করতে হবে? আমরাও পেটের ধান্ধায় এ কাজ করছি বটে, কিন্তু সমাজের খানিকটা বিষ কি আমরাও পান করছি না?

সত্যবান সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলেছিলেন, তুমি কতটা লেখাপড়া শিখেছিলে?

: ম্যাট্রিক পাশ করতে পারিনি। তার আগেই আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

: তারপর? স্বামীর ঘর ছাড়লে কেন?

: সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বলতে পারি—স্বামীর অত্যাচারে! আমার গহনাপত্র কেড়ে নিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত আমাকে আত্মঘাতী হবার পরামর্শ দেন। আমি তাঁর অনুরোধ রাখতে পারিনি। ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিলাম। যার সঙ্গে বেড়িয়েছিলাম সে যে আমাকে চায়নি, আমার দেহটা [illegible]য়ছিল—এবং বছর না ঘুরতেই যে তার মোহ ঘুচে যাবে, এটা বুঝ[illegible]রিনি। যেদিন বুঝলাম, সেদিন এ-ছাড়া আর পথ ছিল না।

: তোমার সন্তানাদি হয়নি?

: হয়েছে। একটি ছেলে।—মুখটা নিচু করে বললে, তার বাবা কে, আমি জানি না। এখন তার বয়স চার।

: এত কথা আমাকে বলছ কেন?

: আপনাকে আমি দেবতার মত শ্রদ্ধা করতাম। বড়দার কাছে শুনে শুনে। কাল আপনাকে দেখে মনে হল, যা হবার তা তো হয়েছে, ছেলেটির সম্বন্ধে আমার কী কর্তব্য সে-কথার পরামর্শ আপনিই দিতে পারেন।

: কাল যে কথা জানতে চেয়েছিলাম, সে কথার জবাব দাওনি।

তোমার বড়দাদার নাম কি?

মেয়েটি হেসে বললে, স্যার! ঐ প্রশ্নটা করবেন না। সে-সব কথা আমি কোন মুখে বলব?

মোটকথা সত্যবান মাস্টারের জীবনে নূতন পর্যায় শুরু হল। পথে পাওয়া মেয়েটিকে তিনি কন্যাত্বে বরণ করলেন। মানুষ মূলতঃ সমাজবদ্ধ জীব। একটু আদর, একটু ভালবাসা, একটু শ্রদ্ধা-প্রীতি-স্নেহ—সে নূতন করে ঘর বাঁধে। সব বাঁধন কাটিয়ে যে মানুষটা বেরিয়ে পড়েছিল পথে, আবার সে ঘরে ঢুকল। নিষিদ্ধ পল্লীতে। বেশ্যার আশ্রয়ে। যে কাজ আর জীবনে করবেন না ভেবেছিলেন, আবার সেই কাজে ব্রত হলেন। পাঠশালা খুলে বসলেন। গুটি আট দশ ছাত্র-ছাত্রী। ওদের মাতৃপরিচয় আছে। পিতৃপরিচয় নেই। তবু সত্যবানের মনে হল—ওরাও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী—ওরা সত্যকামের দল!

সকাল বেলায় গঙ্গাস্নান সেরে পাঠশালায় ওদের নিয়ে বসেন, অঙ্ক কষান, হিন্দী, ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল পড়ান। হাতের লেখা, নামতা মুখস্ত করান। তারপর পিয়ারীবাঈয়ের সশ্রদ্ধ শাকান্ন গ্রহণ করে গুটি গুটি এসে বসেন তুলসীমানস-মন্দিরের সামনে। সেটা তাঁর উপার্জনের রাজপথ—পাঠশালায় পড়ানোটা যেহেতু অবৈতনিক। সন্ধ্যা-বেলা ফিরে আসেন সেই নিষিদ্ধ পল্লীতে। তখন সেখানে বেলফুলের মালা ফিরি হয়, কুল্‌পি মালাই-ওলা হেঁকে যায়; সাহ্‌জীর দোকানে মাটির ভাঁড় হাত ফিরি হতে থাকে, ব্রীজলালের ঝাঁঝরা ঘন ঘন নড়তে থাকে ঘুঘ্‌নির ডেক্‌চিতে। এ-ঘরে ও-ঘরে বাতি জ্বলে ওঠে—ঠুংরি আর গজলে গম্‌গম্ করে চাকলাটা। আধো-অন্ধকারে চোখে কাজল দিয়ে বিনা-ব্লাউসে ব্রা-পরে দাঁড়িয়ে থাকে উত্তীর্ণযৌবনা বারাঙ্গনার দল সদরের চৌকাঠ ধরে। ওরা সবাই চেনে পণ্ডিতজীকে। ওদের মাঝখান দিয়ে হন্‌হনিয়ে পথটা অতিক্রম করে মুরিয়া-টালির একটি খাপরায় প্রবেশ করেন বৃদ্ধ। বুধন ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তার মা হয় দাঁড়িয়ে আছে চৌকাঠ ঘেঁষে, নয় দ্বার রুদ্ধ করেছে পাশের ঘরে। সে-রাতের অতিথির হাতে দৈনন্দিন বিষপান করতে। বৃদ্ধ কেরোসিন ল্যাম্পটা জ্বেলে খাতাপত্র বার করেন। অঙ্ক কষতে শুরু করেন। কঠিন কঠিন অঙ্ক—ক্যালকুলাস, থিয়োরি-অব-ইকোয়েশান, ডিফারেনসিয়াল ইকোয়েশান, হাইড্রলিক্স, স্ট্যাটিক্স, ডিনামিক্স, অ্যাস্ট্রনমি। এগুলি দিয়ে গেছে দিনের বেলায় বি. এইচ. ইউ-র ছাত্ররা। ওরা ম্যাথস্, অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স অথবা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। কি জানি কী সূত্রে ওরা খবর পেয়েছে তুলসী-মানস মন্দিরের বাইরে নিত্য যে বৃদ্ধ বসে থাকেন উনি অঙ্কশাস্ত্রে ধন্বন্তরী!

অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় আবার বিচিত্র রকমফেরও হয়। একদিনের কথা মনে আছে সত্যবান মাস্টারের। রাত তখন দশটা হবে। একটা কঠিন অঙ্কে তিনি ডুবে আছেন। বুধন ঘুমোচ্ছে কাঁথা মুড়ি দিয়ে। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই পিয়ারী হুড়মুড়িয়ে ঢুকল। ওঁর বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করে: আইয়ে পণ্ডিতজী! জলদি!

: ক্যা হুয়া? আরে হাত তো ছোড়ো!

কে কার কথা শোনে! বুধনের মা ওঁকে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায় পাশের ঘরে। সন্ধ্যার পর এ ঘরে উনি কোনদিন আসেননি। একটি বড় বিছানা—ডবলবেডের। চৌকির উপর গদি, দু জোড়া বালিশ। একটা টুলে রেকাবীতে রাখা আছে সাপের মত কুণ্ডলী-পাকানো বেলফুলের মালা। কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর পট। এদিককার দেওয়ালে মহাবীরজীর একটি বাঁধানো ছবি। সেই দ্বৈতশয্যায় বৃদ্ধকে বসিয়ে দিতে দিতেই দ্বারপথে আবির্ভূত হল একটি মাতালের দেহাকৃতি। লোকটা রোষকষায়িত, ঘোলাটে চোখ মেলে দেখলো কক্ষের ভিতরটা। পিয়ারী যেন তাকে দেখতেই পায়নি। সবলে আলিঙ্গন করে ধরল সত্যবান মাস্টারকে। ওঁর তখন দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ দেখতে পাওয়ার চমৎকার অভিনয় করল মেয়েটি। লাফিয়ে

নামল খাট থেকে। এগিয়ে গেল দ্বারের কাছে। আগন্তুককে কি যেন বলল ফিস্‌ফিস্‌ করে। তারপর দ্বার রুদ্ধ করে দিল। জানলা দিয়ে দেখল মাতালটা টলতে টলতে চলে গেল গলিপথ দিয়ে।

সত্যবান সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, ক্যা হুয়া হ্যায় রে বেটি। বহ্‌ কৌন থ্যা?

হঠাৎই জানলা থেকে ছিটকে সরে এল মেয়েটা। রুদ্ধ দ্বারকক্ষে লুটিয়ে পড়ল তার পণ্ডিতজীর পদপ্রান্তে। ওঁর পায়ে অশ্রুসিক্ত মুখটা ঘষতে ঘষতে বললে, মুঝে মাফি কিয়া যায় পণ্ডিতজী! আপ্‌··· আপ্‌ মেরি পিতাজী হ্যায়!

: তা না হয় হলাম; কিন্তু ও লোকটা কে?

অসঙ্কোচে বুধনের মা ব্যাখ্যা দিয়েছিল তার অশালীন ব্যবহারের। ঐ লোকটা স্যাডিস্ট—পার্ভার্ট? নারীদেহ ভোগ করে ও তৃপ্তি পায় না—বীভৎস পন্থায় সে প্রেমাস্পদকে যন্ত্রণা না দিয়ে তৃপ্তি পায় না। ওর বৌ মরেছে গলায় দড়ি দিয়ে। বিকৃতমানস লোকটা পর্যায়ক্রমে এ পল্লীর প্রতিটি মেয়ের ঘরে যায়। উচ্চমূল্য দিতে তার আপত্তি নেই—কিন্তু হতভাগিনী পরদিন শয্যাত্যাগ করতে পারে না।···

বক্তাকে মাঝপথে থামিয়ে সাবিত্রী বলে ফেলেছিলেন, আশ্চর্য মানুষ তুমি! বেশ্যামাগীর মিথ্যে নাগর সাজতে তোমার বিবেকে বাধল না, অথচ নিজের সন্তানের মুখ চেয়ে···

সত্যবান বললেন, তাই যে হওয়ার কথা সাবি! তোমরা ইন্‌-ফিনিটি দিয়ে ভাগ করতে চেয়েছিলে তাই ভাগফল হল শূন্য, বুধনের মা শূন্য দিয়ে ভাগ করতে চেয়েছিল তাই ফল হল: অনন্ত!

যে-কথা জীবনভর বারে বারে বলেছেন, আবার তাই বললেন, বুঝলাম না!

: এ অঙ্কশাস্ত্রের কথা সাবি, তুমি তো বুঝবে না। এ আমার ধর্মমঙ্গল। তবে তোমার ধর্ম দিয়েও এর ব্যাখ্যা আছে—তুমি তো গীতাপাঠ কর। ফলের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই আছে পাপের স্পর্শ, ফলা-

কাঙ্ক্ষা বর্জিত কর্মে নেই। তোমরা আমাকে যে মিথ্যাচরণ করতে অনুরোধ করেছিলে তার মধ্যে আমার স্বার্থ জড়িত ছিল; বুধনের মায়ের নাগর সাজায় আমার কোনও স্বার্থ ছিল না।

সাবিত্রী হয়তো বুঝলেন, হয়তো বুঝলেন না। বললেন, না। ওখানে আমি উঠতে পারব না বাপু। তুমি একটা ঘর-টর দেখে রেখ বরং।

: সত্যিই তুমি ফিরে আসবে সাবি?

: বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার? এই বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে মুখ করে তিন সত্যি করছি—আসব, আসব, আসব! এক ম্যাসের মধ্যেই।

বৃদ্ধও এবার অপ্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন করলেন, বৌমার কি হয়েছিল? ছেলে না মেয়ে?

: ছেলে। নিতুনের বয়স এখন প্রায় পাঁচ। ওকে নাসারী স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে টনি। ফট্ ফট্ করে ইংরাজী বলে।

: আর অঙ্ক?

নিতুনই প্রথম দেখতে পেল ওঁদের: গ্র্যা—নী!

স্ত্রীকে নিয়ে কামরাগুলো খুঁজতে খুঁজতে অগ্রসর হচ্ছিলেন সত্যবান মাস্টার। জনাকীর্ণ বারাণসী স্টেশন। মেল ট্রেনটা এসে দাঁড়িয়েছে। থ্রি-টায়ার্স গাড়ির জানলায়-জানলায় উঁকি দিচ্ছিলেন। হঠাৎ শিশুকণ্ঠের আহ্বান শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন।

সাবিত্রী ঝাড়া হাত-পা। উঠে যান কামরায়। সত্যবান দাঁড়িয়ে থাকেন প্ল্যাটফর্মেই। এতক্ষণে দেখতে পেয়েছেন ওদের। জানলার ধারেই সীট পেয়েছে ওরা। দুটো লোয়ার, দুটো মিডল্ বার্থ। সত্যবান আন্দাজ করেন, নিচের দুটি বেঞ্চে নিশ্চয় শোবেন সাবিত্রী ও বৌমা। ছোটখোকা আর নিতুন—না, নিতুন হয়তো তার ঠাম্মার কোল ঘেঁষেই—কি জানি! 'ঠাম্মা' তো নয়, গ্র্যানি! হয়তো ঠাকুমার

বুকে মুখ গুঁজে শোয়ার—যেমন শুতেন তিনি ছেলেবেলায়—রেওয়াজ আজকাল নেই।

বৌমা একটু মুটিয়েছে। সেই ছিপছিপে মেয়েটি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এ পাঁচ বছরে দিব্যি গিন্নিবান্নি হয়ে গেছে। সত্যবান ভাবতে থাকেন—বিবাহের পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে সাবির কি এতটা পরিবর্তন হয়েছিল? আজু যখন চার বছরের? না, তখনও সাবি ছিলেন ছিপছিপে। অবশ্য অনেক কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল সাবিত্রীর—মাত্র পনের বছরে। অথচ বৌমার বিয়ে হয়েছিল তেইশ-চব্বিশে। সুতরাং···

আশ্চর্য! সুরমা ভুলেও একবার প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকালো না। সে বসেছে নিতুনের মুখোমুখি একেবারে জানলার ধারে। তার মানে সে ওঁকে লক্ষ্য করেছে। টনিও দেখা গেল খুব ব্যস্ত, মালপত্র বুঝে নিতে। ভীড় ঠেলে সাবিত্রী তখনও পেঁছতে পারেননি। হঠাৎ নিতুন তার মাকে প্রশ্ন করে, লুক দ্যাট্ ওল্ড চ্যাপ্, মম্?

ঠিক সেই মুহূর্তেই চোখাচোখি হল। মরমে মরে গেলেন সত্যবান মাস্টার। মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন। সুরমাও নিশ্চয় তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে ফিরে ছিল—তাই হওয়া সম্ভব—সত্যবান জানেন না। দেখতে পাননি, শুধু শুনতে পেয়েছিলেন: ডোণ্ট বি নটি! চুপ করে বসে থাকো। সত্যবান ততক্ষণে চলমান হুইলারের দোকানে ঝুঁকে পড়েছেন।

: এই যে শুনছ? অগত্যা ফিরতেই হল। সাবিত্রী ততক্ষণে পেঁছেছেন অকুস্থলে। নিতুনের পাশটিতে বসে পড়েছেন—নিতুনই তো ছেলেটার নাম? হ্যাঁ নিতুনই। পুরো নামটা কি? নিত্যানন্দ? সেদিকে ফিরতেই সাবিত্রী বললেন, এই হচ্ছে নিতুন। যার কথা বলছিলাম?

সত্যবানের কি করা উচিত? হাত বাড়িয়ে ঐ বাচ্চাটার গাল দুটো টিপে দেওয়া? অথবা—

রক্ষা করলেন এক ভদ্রলোক : কণ্ডাক্টার গার্ডকে দেখেছেন ?

তৎক্ষণাৎ পরোপকারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন সত্যবান মাস্টার কিন্তু তাতেও ট্রেনছাড়ার সময়টুকু পার হল না। অচিরে হাজির হলেন সেই অন্তহৃত কণ্ডাক্টার গার্ড। অগত্যা আবার এদিকে ফিরতে হল।

: তুমি উপরে উঠে এস না? তোমাকে প্রণাম করা হয়নি। সাবিত্রী ডাকলেন।

কী বিড়ম্বনা! এটা কি ইচ্ছাকৃত? ছেলে এবং ছেলেবউকে দেখিয়ে দেখিয়ে পদধূলি নিতে চান? সত্যবান বলেন, নাঃ! গ্রীন সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে। এখনই ট্রেনটা ছাড়বে। হাসলেন, তারপর রসিকতাও করলেন, আর আশীর্বাদ করার আগেই তো-সাবিত্রীসমান হয়ে বসে আছ।

বেশ জোর গলাতেই বললেন। টনি এবং তার স্ত্রীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। যেন উটকো যাত্রীদের সহযাত্রী হিসাবে ওঁর স্ত্রী ট্রেনে যাচ্ছেন। টনি এবং তার স্ত্রী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। নিতুন অবাক বিস্ময়ে দেখছিল ওঁকে। এতক্ষণে অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছেন। তিনি কারও পরোয়া করেন নাকি? জানলা গলিয়ে বলিরেখাঙ্কিত হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। নিতুনের গালটা টিপে দিলেন।

হুইসিল বাজল। আস্তে দুলে উঠল কামরাটা। ঝুঁকে পড়লেন সাবিত্রী। যেন ম্যাগনাকার্টা পড়ছেন! বেশ জোর গলায় ঘোষণা করলেন, কালীপূজার আগেই ফিরব আমি। তোমাকে টেলিগ্রাম করে দেব ঐ ধর্মশালার ঠিকানায়। স্টেশনে এস। আমি হয়তো একাই আসব। বুঝলে ?

: দু-চারদিন হাতে সময় নিয়েই টেলিগ্রামটা কোরো! বলা তো যায় না, যদি দেরীতে···

ট্রেনটা চলতে শুরু করেছে। সাবিত্রী পুনরায় বলেন, দু-চারদিন

নয় সাতদিন সময় নিয়ে প্রিপেড টেলিগ্রাম করব। জবাবে তুমি জানিও যে স্টেশনে থাকবে। কেমন? না হলে আমি একা মানুষ, বিদেশ-বিভূঁইয়ে···

বাকিটা শোনা গেল না। ট্রেনটা গতিলাভ করেছে। বাই-নোমিয়াল থিয়োরেমের মত এর পর শুধু ডট্-ডট্-ডট্···। তা হোক সিরিজটা চেনা। সত্যবান মাস্টারের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। অপস্রিয়মান কামরাটার দিকে হাত নেড়ে উনি বললেন, আ—চ্ছা!

ট্রেনটা বাঁক নিচ্ছে। একটা মসৃণ বক্ররেখায়।

হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলেন সত্যবান মাস্টার। পুরিওয়ালা অবাক হয়ে ওঁর দিকে ফিরলো। সত্যবানের হঠাৎ মনে হল—সাবিত্রীর 'লোকাস্' অর্থাৎ সঞ্চারপথ একটি বিচিত্র অধিবৃত্ত! সমান দূরত্ব রক্ষা করে তিনি জীবনপথ অতিক্রম করছেন। তাঁর 'নিয়ামক' একটি সরল রেখা—একাধিক উপাদানে গঠিত : পুত্র-পুত্রবধূ-পৌত্র—অমৃত ব্যানার্জি রোডের সেই দ্বিতলবাড়ির নিরাপত্তা-অভ্যস্ত কুটুরি—তাঁর গোপাল, গণেশ ঠাকুরঘরের সান্ত্বনা। আর দ্বিতীয় আকর্ষণ—'নাভি', তিনি নিজে। নিয়ামক আর নাভি। ডিরেক্‌ট্রিক্স আর ফোক্‌স। দীর্ঘায়ত ডিরেকট্রিক্স আর বিন্দুবৎ ফোক্‌স। দুইয়ের আকর্ষণে, সমদূরত্ব বজায় রেখে যে পথে সাবিত্রী বাকি জীবনের দুকুড়ি সাতের খেলা খেলতে চান সে সঞ্চারপথ : অধিবৃত্ত!

অর্থাৎ, প্যারাবোলা!

তাই এই অট্টহাস্য! কী নামই দিয়েছিল ছেলেরা! জীবন সঙ্গিনীকে পর্যন্ত সেই 'প্যারাবোলিক-পাত'-এ পড়ে ফেলেছেন প্যারাবোলা-স্যার
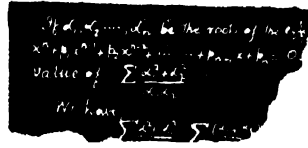
: ছোটখোকা! তুই অমন অসভ্যতা করলি কেন?

টনি মালপত্র সাজিয়ে নিয়ে বসেছে। গাড়ি ছেড়েছে কাশী স্টেশন। ওদের খোপে তখন শুধু ওরাই চারজন। বাকী দুজন যাত্রী তখন নেই। টনি ভুরু কুঁচকে বললে, অসভ্যতা মানে? কী বলতে চাইছ?

: বাপ বলে তো স্বীকার করিস। তাহলে নেমে একটা পেন্নাম করতে পারলি না? কী ভেবেছিলি? ও তোব কাছে টাকা ধার করবে, না খোরাকি দাবি কববে?

টনি গম্ভীর হয়ে বললে, বাধাটা যে টাকা-পয়সার নয়, তা তুমিও জান। ঠিকানাটা বল, মাসে মাসে না হয় মানি অর্ডার করব কিছু করে।

: তোর রোজগারের টাকা ও নেবে ভেবেছিস?

: তা হলে আমি নাচার। ওঁর জীবন-দর্শনের সঙ্গে আমাদের জীবন যে মিলবে না তা তো প্রমাণিতই হয়ে গেছে। আর কি করতে পারি আমি?

: করতে পারিস অনেক কিছুই। সে-সব কথা তুলছি না; কিন্তু চেনা মানুষ দেখলে মানুষে যে ভদ্রতা করে সেটুকু করলি না কেন?

সুরমা দাঁতে দাঁত দিয়ে থাকে। কোন কথা বলবে না। টনিই জবাব দেয়, তুমিই না একদিন বলেছিলে ওঁর সঙ্গে এক ছাদের নীচে থাকতে পারবে না?

: বলেছিলাম। কিন্তু সে তো পাঁচ বছর আগের কথা, ছোট-

খোকা। সে-সব ব্যাপার তো চুকে-বুকে গেছে। চিরটাকালই কি তার জের টেনে চলতে হবে? মানুষটা কীভাবে আছে···

বাধা দিয়ে টনি বলে, থাক মা। ও সব কথা আমি শুনতে চাই না। তবে এখনই তো শুনলাম কালীপুজার আগেই তুমি ফিরে আসছ। এবার বোধহয় আর হাত পুড়িয়ে খেতে হবে না ওঁকে।

পাথর হয়ে গেলেন যেন সাবিত্রী। বেশ বুঝতে পারেন এতে ওরা খুশী। বুড়োটা বিদায় হয়েই ছিল, এবার বুড়িটাও গেল। একেবারে ঝাড়া-হাত-পা। এর পর আর অমৃত ব্যানার্জী রোডের হেঁসেলে মুরগী ঢুকতে অসুবিধা হবে না। সন্ধ্যাবেলা মায়ের সঙ্গে কথা বলার আগে টনিকে এলাচ চিবোতে হবে না। সুরমাও যোগ দেবে বেলেল্লাপনায়।

গাড়ি গঙ্গায় উঠেছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন সাবিত্রী। সেই কাশীর পরিচিত গঙ্গার তীর। বহুবার বহু ছবিতে দেখেছেন, শুধু একটি ব্যতিক্রম নজরে পড়ল। বেণীমাধবের ধ্বজাটা নেই। শুনেছেন, জরাজীর্ণ মসজিদটাকে ভেঙে ফেলতে হয়েছে। মসজিদটার কাঠামোটা টিকে আছে কোনক্রমে। তাকে আজ আর চেনা যায় না। জনতার ভীড়ের মাঝখানে ধ্যানমগ্ন মহাযোগীর মত উর্ধ্ববাহু বেণীমাধবের ধ্বজাটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে!

সত্যবান প্যারাবোলা!

না, ওঁর কৌলিক উপাধি যে চক্রবর্তী, সে-কথা তো আগেই বলেছি। 'প্যারাবোলা' একটা খেতাব, একটা আদরের ডাক। অঙ্কের মাস্টারমশাইকে ছাত্ররা ভালবেসে ঐ খেতাবটা দিয়েছিল। কবে? তা সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। কেন? অর্ধশতাব্দীর এপার থেকে আজ তার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া শক্ত। সে যুগে যাঁরা ছিলেন তাঁর আশেপাশে—কার্তিকবাবু, প্রবোধবাবু, সুশীলবাবু, পণ্ডিতমশাই, ড্রয়িং-স্যার অথবা মৌলভী সাহেব তাঁরা

আজ কে কোথায়, বেঁচে আছেন কিনা, তাই বা কে জানে! সত্যবান চক্রবর্তী সে আমলে ছিলেন ভবতারণ এইচ. ই. স্কুলের থার্ড মাস্টার। উপরের ক্লাসে অঙ্ক শেখাতেন। ম্যাথমেটিক্স আর মেকানিক্স। তখন ঐ রকমই ভাগ ছিল—পাটিগণিত, বীজগণিত আর জ্যামিতি নিয়ে ম্যাথমেটিক্স ; আর বলবিদ্যা, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদি নিয়ে মেকা-নিক্স। অসাধারণ দক্ষতা ছিল অঙ্কশাস্ত্রে। অসাধারণ মেধা আর স্মৃতিশক্তি। যাদব চক্রবর্তী, কে. পি. বোস আর হল অ্যাণ্ড নাইট ছিল ওঁর কদমছাঁট চুলেভরা খোপরির অন্তরালে গ্রে সেল-এর খাঁজে খাঁজে সাজানো।

ক্লাসের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করার আগেই উইংস্ এর আড়াল থেকে শোনা যেত নেপথ্য-ভাষণ :

: সিডাউন, সিডাউন বয়েজ! নাউ টেক ডাউন—

বকের মত পা ফেলে ফেলে সিধে চলে যেতেন ব্ল্যাকবোর্ডে। প্রথমেই একটা অঙ্ক লিখে দিতেন স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে। শুধু প্রশ্ন নয়, তারপর ব্র্যাকেট বন্ধনী যোগে লেখা থাকত C. U.'15, LUCK 20, Dac 19 ইত্যাদি। অর্থাৎ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ঐ ধূমকেতুটি আবির্ভূত হয়েছিল প্রশ্নপত্রের আকাশে। ছেলেরা মাথা হেঁট করে আঁক কষত। প্যারাবোলা-স্যার ব্ল্যাকবোর্ড থেকে ফিরে এসে বসতেন চেয়ারে। হাজরির খাতাখানা খুলতেন না। পকেট থেকে একটি চিরকুট বার করে উদ্যত-কলম প্যারাবোলা-স্যার আউড়ে যেতেন স্থানকালোপযোগী পাত্রকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম : নীতুন, বটকৃষ্ণ, পটল, হরিদাস—এক, গজেন, সুবোধ, হরিদাস-দুই, শিবেন···

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। ওঁর পূর্বপুরুষে শ্রুতিধর কেউ ছিল কি না এ গবেষণা করা হয়নি, উনি নিজে ছিলেম ছাত্রধর। দীর্ঘ কর্মময় জীবনে কোনদিন কেউ 'প্রক্সি' দিতে পারেনি তাঁর ক্লাসে। এ একেবারে শিক্ষক-ইতিহাসে আনব্রোকন-রেকর্ড! কারণ প্রতিটি

সেকসানে প্রতিটি ছাত্রের নাম স্মৃতিপটে রোল-নাম্বার অনুযায়ী পর-পর সাজানো। শুধু নাম নয়, তাদের হাঁড়ির তলদেশের খবর। কে কি দিয়ে ভাত খায়। ছেলেরা একে একে উঠে দাঁড়ায়। নিঃশব্দে। শব্দ করা বারণ—আর পাঁচটা ছেলে আঁক কষছে, দেখতে পাস্ না? বাঁদর কোথাকার! আর তাছাড়া আর পাঁচজন স্যারের মত প্যারা-বোলা-স্যার তো হাজরি-নিবদ্ধ-দৃষ্টি নন—প্যাট্ প্যাট্ করে তাকিয়ে আছেন। তাই এ ক্ষেত্রে ইয়েস স্যার। প্রেজেণ্ট স্যারের হাঁকাড় পাড়াটা বাহুল্য।

সুশীলবাবু ইংরাজীর স্যার। একদিন টিচার্স রুমে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, ওটা কি টুকছেন চক্কোত্তিমশাই? আপনার হাতে ওটা কিসের 'চোথা'?

হেসেছিলেন চক্রবর্তী: চোথাই বটে! অ্যাটেণ্ডেন্স রেজিস্টারে হাজরি তুলছি।

: কেন? ক্লাসে রেজিস্টার নিয়ে যাননি?

মৃদু হেসেছিলেন চক্রবর্তী। জবাব দেননি। ওপাশ থেকে পণ্ডিতমশাই অন্বয় ব্যাখ্যা দাখিল করেছিলেন প্যারাবোলা-স্যারের ব্যাপারে নাক গলাবেন না সুশীলবাবু। উনি ক্লাসে রোল-কল করেন বিচিত্র কায়দায়। ছাত্রদের সময় নষ্ট হবে যে! কী সব দিগ্‌গজ পণ্ডিত হবেন এক-একজন!

এবার মৃদু প্রতিবাদ করেছিলেন চক্রবর্তী, এটা অন্যায় বলছেন পণ্ডিতমশাই। দিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়তো সবাই হবে না। তবে কেউ কেউ নিশ্চয় মানুষের মত মানুষ হবে। আমার এই সময়-সংক্ষেপ করার প্রচেষ্টা কি খারাপ বলতে চান?

তৈল-বার্তাকুর নিপাতনে-সিদ্ধ সন্ধি হল। পণ্ডিতমশাই খিঁচিয়ে ওঠেন, কিস্যু হবে না, কারও কিস্যু হবে না! বুঝেছেন? অনড্বান হবে এক একটা! বলিবর্দ! আপনি তো মশাই আশু মুখুজ্জে গুলে খেয়েছেন, কিছু হল? সেই তো থার্ড মাস্টারে ঠেকে আছেন। কেউ

আপনাকে ধরে ইস্কুল-ইন্সপেক্টর করে দিল ?

এবার হেসে ফেলেছিলেন চক্রবর্তী। জবাবে বলেছিলেন, না তা করে দেয়নি। কিন্তু কিছু মনে করবেন না পণ্ডিতমশাই, সেটা কেউ দিলেও আমি নিতাম না।

: নিতেন না ! কী নিতেন না ?—এবার সপ্রশ্ন হল সুশীল দত্ত।

: ঐ স্কুল-ইন্সপেক্টরের চাকরিটা—মানে সদাশয় সরকার-বাহাদুর অফার করলেও।

: কেন ? সদাশয় সরকার বাহাদুরের উপর এতটা সদয় কেন ? সুশীলবাবু নব্যযুগের মাস্টার। সদ্য ঢুকেছেন স্কুলে। সি. আর. দাসের চ্যালা। ঐ সদাশয় সরকার-বাহাদুর কথাগুলো বিঁধেছিল তাঁকে। চক্রবর্তী বলেছিলেন, তাহলে মাহিনা হয়তো অনেক বৃদ্ধি পেত, কিন্তু আর তো ক্লাস নিতে পারতাম না।

এ একেবারে ওঁর অন্তরের কথা। উনি যেন এ ধরাধামে নরদেহে অবতীর্ণ হয়েছেন শুধুমাত্র অঙ্কের ক্লাস নিতে। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ যথাক্রমে এরিথমেটিক-অ্যালজেবরা-জিওমেট্রি-কনিক সেকশন ! ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে তাঁকে রোখা যায়নি। ক্লাস তাঁকে নিতেই হবে। না নিয়ে উপায় আছে ? সিলেবাসটা একবার দেখ ! আর শুধু যাদব-চন্দ্রকে শেষ করলেই তো হবে না, আশু মুখুজ্জের পাটিগণিতে যে আরও মজার মজার অঙ্ক আছে। 'মজা' অবশ্য ওঁর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে—সেগুলো আরও প্লীহাচমৎকারী ! তারপর ধর গিয়ে এক্সট্রা। তার কি আদি অন্ত আছে ? 'হল অ্যাণ্ড নাইট'-এ নেই এমন এক্সট্রার সঙ্কলনও যে ওঁর হাজারের উপর। সময় কই ? তাই ওঁর অভিধানে রেনি-ডে বলে কোন শব্দ নেই। জ্বর গায়েও কতবার ক্লাস নিতে এসেছেন আলোয়ান মুড়ি দিয়ে। এ-জন্য সি. আর. দাসের উপরেও তিনি খাপ্পা—তিনি অবশ্য গত হয়েছেন, খাপ্পা গান্ধী-মহারাজের উপরেও। অফিস-আদালত বর্জন কর, তাতে কার কি আপত্তি ?—কিন্তু তাই বলে মা সরস্বতীকে বর্জন !

ভবতারণ এইচ. ই. স্কুলে কিন্তু বেশিদিন টিকে থাকতে পারেননি।

দোষটা অবশ্য ওঁর নিজেরই। একটা সাধারণ অঙ্ক কষতে পারেননি, যে অঙ্ক ওঁর ধর্মপত্নী সাবিত্রী পর্যন্ত কষতে পারতেন। একদিন হেডমাস্টার মশাই ওঁকে জনান্তিকে ডেকে বললেন, এটা কী করেছেন চক্কোত্তি মশাই? বটুক অঙ্কে মাত্র সাত পেয়েছে? খাতাটা মেলে ধরেন ওঁর নাকের ডগায়।

দেখবার প্রয়োজন ছিল না। কে কত পেয়েছে তা মনে আছে সত্যবান মাস্টারের। সংক্ষেপে বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, সাতই পেয়েছে। কেন?

: বটুক ভট্টাচার্যের পুরো পরিচয়টা জানেন? ও কে? কী বৃত্তান্ত?

: কেন জানব না? ও তো হরিহর জ্যোতিষার্ণব মশাইয়ের কনিষ্ঠপুত্র।

: হ্যাঁ; কিন্তু টিট্টিভ যে সমুদ্রকে ব্যাকুল করতে পারে তা কি জানেন? এ খবর কি রাখেন যে, আমাদের রায়সাহেব ঐ জ্যোতিষার্ণবের নির্দেশ ছাড়া এক পা চলেন না? কোন শেয়ার ধরবেন, কোনটা ছাড়বেন, কোন ঘোড়া ধরবেন-ছাড়বেন, কোন সম্পত্তি কিনবেন-বেচবেন তা নির্ধারণ করে দেন ঐ হরিহর জ্যোতিষার্ণব?

এ গুহ্যতথ্য জানা ছিল না চক্রবর্তীর। বলেন, আজ্ঞে না। এসব কথা জানতাম না।

: এখন তো জানলেন। খাতাখানা নিয়ে যান। আমি ওটা দেখেছি। তিন তিনটে অঙ্কে প্রায় শেষ স্টেপে ভুল করেছে। ক্ষমা-ঘেন্না করে মেনে নিল ঐ লাস্ট স্টেপে ভুল হয়নি। তিন দশে ত্রিশ দিয়ে সাতকে সাঁইত্রিশ করে দিন।

অনেক বাঘা বাঘা অঙ্ক কষেছেন সারাজীবনে। কিন্তু সাত

ইজুকালটু সাঁইত্রিশ কী করে প্রমাণ করা যাবে সেটা বুঝে উঠতে পারেন না। স্বীকার করলেন অক্ষমতা। বিরক্ত হলেন হেডমাস্টার মশাই। বললেন, দেখুন মিস্টার চক্রবর্তী, খোলা কথা বলছি। রায়সাহেব আমাদের গভর্ণিং বডির প্রেসিডেন্ট। তিনি নিজে আমাকে ডেকে বললেন, বটুক অঙ্কের পেপারটা খারাপ দিয়েছে। ওকে যেন একটা চান্স দেওয়া হয়। আর এ তো ফাইনাল পরীক্ষা নয়, টেস্টে অ্যালাও করে দেওয়া।

সত্যবান চক্রবর্তী মুখটা আর তুলতে পারেন না। 'মিস্টার চক্রবর্তী' শুনেই বুঝেছেন হেডমাস্টার মশাই মর্মান্তিক চটেছেন। অধোবদনে বলেন, একটা পেপারে ফেল হলেও তো তাকে অ্যালাও করা যায়। সেটা আপনার এক্তিয়ারে। তাই কেন করুন না?

এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল হেডমাস্টার মশায়ের। প্রায় ধমকে ওঠেন উনি, সেটুকু বুদ্ধি আমার ঘটেও আছে। হতভাগাটা যে ইংরাজী আর বাংলাতেও ফেল করেছে।

: তিন-তিনটে মেইন সাবজেক্টে?

: সেটা ভিতরের কথা। সুশীলবাবু আর রমেনবাবু গ্রেস মার্ক দিয়ে সে ছুটো পেপার ম্যানেজ করে দিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসে তাকে কি করে পাস করাই? হতভাগাটা পরীক্ষাই দেয়নি। অ্যাবসেন্ট! বুঝুন কাণ্ড! ব্ল্যাঙ্ক পেপারকেও পাস মার্কায় টেনে তোলা যায়; কিন্তু 'অ্যাবসেন্ট'কে কেমন করে পাস করাই সে বুদ্ধিটা বাৎলাতে পারেন?

কদমছাঁট চুলেভরা মাথাটা নেড়ে সত্যবান মাস্টার বলেন, তা বটে! ওর আর চারা নেই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই জানি কি না। আমি নিজেই বি. এস্-সিতে একটা পেপারে অ্যাবসেন্ট ছিলাম।

হেডমাস্টার বললেন, জানি। দেখুন সত্যবানবাবু আপনার সমস্যাটা আমি বুঝতে পারি। আপনার সঙ্গে তিন বছর কাজ করছি। সবই জানি আমি। কিন্তু কী করবেন বলুন? সংসার ত্যাগ করে বনে

গিয়ে তো বাস করতে পারবেন না ? এই হচ্ছে ছনিয়াদারার কানুন। বিদ্যা-বিতরণ, শিক্ষকতা, অধ্যাপনা—যত গালভারী শব্দই ব্যবহার করুন, আসলে আমরা চাকরি করছি। গোলামী ! হুকুমের চাকর।

পুনরুক্তি করলেন চক্রবর্তী : আমাকে মাপ করবেন।

এবার যেন অপমানিত বোধ করলেন হেডস্যার। যেন ঐ বিনয়াবনত মানুষটা বলতে চাইছে : আজ্ঞে না। আপনি হুকুমের চাকর। আমি নই !

গম্ভীর হয়ে বললেন, কাজটা কিন্তু ভাল করলেন না আপনি। খাতা আমি অন্য কাউকে দিয়ে রি-এগ্‌জামিন করিয়ে নেব। বটুক অঙ্কে পাশও করবে, টেস্টে 'অ্যালাও'ও হবে ; মাঝ থেকে আপনার হয়তো কিছু, মানে অসুবিধা হতে পারে।

বিষণ্ণ হাসি হেসে, সত্যবান বলেছিলেন, উপায় কি বলুন ? সহ্য করতে হবে।

: হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাপারটা কতদূর গড়াতে পারে তা কি আন্দাজ করতে পারছেন ?

.. : পারছি স্যার। নিউটন্‌স্ থার্ড ল। ইকোয়াল অ্যাণ্ড অপোসিট রিয়্যাকশন। আঘাতের সমপরিমাণ প্রত্যাঘাত।

: না !—প্রায় ধমক দিয়ে উঠেছিলেন হেডস্যার। বলেন, জীবনটা অঙ্ক নয় চক্কোত্তিমশাই ! নিউটনের ঐ থার্ড ল অঙ্কশাস্ত্রের বইয়ের বাইরে কোথাও নেই। এই প্রবলের ছনিয়ায় প্রত্যাঘাতটা আঘাতের সম-অনুপাতে হয় না। এখানে যে সূত্রে অঙ্ক কষা হয় সেটাকে বলে : লঘু পাপে গুরুদণ্ড ! বুয়েছেন ?

সত্যবান অনমনীয়। বুনো ঘোড়ার মত ঘাড় গুঁজে বলেন, তাহলে সেটাই সহ্য করতে হবে।

তাই করেছিলেন। বটুক পাস করল, ফেল মারলেন প্যারাবোলা-স্যার। টেস্টে অ্যালাও হয়ে বটুক গেল ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে এবং তিন মাস পরে ম্যাট্রিকে ফেল হওয়ার সংবাদটা প্রচারিত হওয়ার

পুর্বেই চাকরিতে ইস্তফা দিলেন সত্যবান মাস্টার। না, বরখাস্ত তাঁকে করা হয়নি : কিন্তু পরিস্থিতি চতুর্দিক থেকে এমন ভাবে তাঁকে ঘিরে ধরল যে, আত্মসম্মান বজায় রাখতে চাকরিটাই ছেড়ে দিলেন।

বিদায়ের দিনেও তিনি অনমনীয়। বরং ভেঙে পড়লেন হেডমাস্টার মশাই স্বয়ং। পুনরায় জনান্তিকে ওঁকে ডেকে হাত ছুটি ধরে বললেন, বিশ্বাস করুন সত্যবানবাবু, আমি চেষ্টার ক্রটি করিনি। কিন্তু কিছুতেই শেষ রক্ষা করতে পারলাম না। রায়সাহেব সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলেন।

চক্রবর্তী বলেছিলেন, আপনি আর কি করতে পারেন ? আমারই ছুর্ভাগ্য !

কোঁচার খুঁটে চশমার কাচটা মুছে নিয়ে হেডমাস্টার মশাই বলেছিলেন, ভুল বললেন সত্যবানবাবু। ছুর্ভাগ্য আপনার নয়, আমার, আমাদের। এর পবেও গোলামী করব আমরা। শিক্ষাব্রত উদ্‌যাপন করছি বলে মনকে চোখ ঠেরে আত্মপ্রসাদ লাভ করব। সৌভাগ্য তো আপনাব। ঐ দেখুন ছেলেরা বারান্দায় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আপনাকে বিদায় জানাবে বলে। যান, ওদের কাছে যান।

: আপনি আসবেন না স্যার ?

: আসব। আসতে আমাকে হবেই। ওদের মুখোমুখি না দাঁড়ালে গোলামী বজায় রাখব কেমন করে ? কিন্তু আজ নয়। আজ আপনার পাশাপাশি ওদের সামনে গিয়ে কিছুতেই মাথা সোজা রেখে দাঁড়াতে পারব না। আপনি একাই যান।

হেডমাস্টার মশাই বিদ্বান। সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। চক্রবর্তী গিন্নি বিদ্বান নন। তাই প্রশ্ন করেছিলেন, অধরবাবু যখন সাতকে সাঁইত্রিশ করে দিতে পারলেন তখন তুমিই বা তা পারলে না কেন ?

ম্লান হেসে সত্যবান বলেছিলেন, সব কাজ কি সবাই পারে ?

: কেন পারে না? কাটাকুটি তো কিছু করতে হত না, সাতের বাঁয়ে একটা তিন বসিয়ে দেওয়া। ব্যাস্!

: তাই তো! এত সহজ অঙ্কটা তো আমার মাথায় ঢোকেনি! কিন্তু সাবি, ঐ সহজ হিসাবে আমার বাঁয়ে যদি কেউ একটা এক বসিয়ে দেয়?

ডাগর দুটি চোখ মেলে বিশ বছরের বধূ বলে, বুঝলাম না। মানে?

: আমার বয়স তো সাতাশ, তোমার ঐ প্রসেসে কেউ যদি তার বাঁয়ে একটা এক বসিয়ে বয়সটা একশ সাতাশ করে দেয়? তখন তো বুড়ো বর দেখে ভিরমি যেতে। তখন হয়তো আমাকে ছেড়ে তোমার সেই বেনারসী 'ল্যভার'-এর ঘরে গিয়ে ঢুকতে!

সত্যবানের বুকে মুখ লুকিয়ে সাবিত্রী বলত: ধ্যেৎ! তোমার মুখে আর কিছু আটকায় না! কিন্তু মাইনে না পেলে কাল থেকে আমরা খাব কি? খোকন···

মনটা প্রফুল্ল ছিল প্যারবোলা-স্যারের। ছাত্রদের অশ্রুবিধৌত শ্রদ্ধার্ঘ্যে মনটা ভরে আছে। আদর্শচ্যুত হতে হয়নি তাঁকে। মেরুদণ্ড সোজা রেখে বেরিয়ে এসেছেন স্কুল থেকে। কাল থেকে এ সংসারে কিভাবে উনান জ্বলবে এ নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা ছিল না। না, 'জীব দিয়েছেন যিনি' জাতীয় শ্লোকে তিনি বিশ্বাস করেন না; জানেন— চিন্তামণি কোন কালেই চিনি জোগান না, সেটা জোগান দেয় বীজু-মুদি নগদ পয়সা ফেললে। কিন্তু এটুকু তিনি জানতেন সমস্ত কালীঘাট অঞ্চলে এ পাঁচ বছরে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। অধ্যবসায় আছে যে ছাত্রের অর্থাৎ গাধার মত খাটতে যে ছেলে রাজী, তার বুদ্ধি গাধার মত হলেও ক্ষতি নেই। প্যারাবোলা-স্যার তাকে পিটিয়ে ঘোড়া করতে পারেন। তখন সেই গাধা সার্কাসের ঘোড়ার মত টপাটপ বেড়া ডিঙোতে পারে। অসংখ্য ছাত্রের অভিভাবক তাঁকে বারে বারে অনুরোধ করেছেন—কিন্তু স্কুল আইনে কোন ধারায় নাকি লেখা আছে 'প্রাইভেট-টুইশানি' নিষিদ্ধ, তাই কখনও স্বীকৃত হননি

তিনি। অভিভাবকরা বলতেন, কই মশাই, এমন কথা তো বাপের জন্মে শুনিনি। আমরাও ঐ স্কুলে পড়েছি—প্রাইভেট স্কুল, সবাই আবহমানকাল প্রাইভেটে পড়াতেন, এখনও পড়ান—আপনিই বা…

বাধা দিয়ে উনি বলতেন, পিনাল কোডে যত অপরাধের উল্লেখ আছে সবগুলিই তো আবহমানকাল থেকে ঘটে আসছে। সেটা কি কোন যুক্তি ?

এখন তিনি বন্ধনমুক্ত। সুতরাং কাল থেকে কিভাবে সংসার চলবে, চাব বছবের শিশুপুত্রটিকে কিভাবে মানুষ করে তুলবেন সে চিন্তা ওঁর আদৌ ছিল না। এ চিন্তা ওঁব মনের প্রফুল্লতাকে হরণ করতে পারেনি। এবারেও রসিকতা করে বললেন, আমি না খেয়ে মরলেও ক্ষতি নেই। তুমি আমকে বাঁচিয়ে তুলবে। সেজন্যই তো তোমাব নাম : সাবিত্রী !

না। চক্রবর্তী গৃহিণীর পিতৃদত্ত নামও 'সাবিত্রী' নয়। সত্যবান চক্রবর্তী যেমন খেতাব পেয়ে হয়েছিলেন প্যারাবোলা স্যার, চক্কোত্তি-গিন্নি ননীবালাও তেমনি রাতারাতি খেতাব পেয়েছিলেন একটা। 'প্যারাবোলা' নামের উৎপত্তিগত ইতিহাসটা হারিয়ে গেছে, কিন্তু 'ননীবালা' কি করে 'সাবিত্রী' হলেন তার পুরো বৃত্তান্তটা জানা যায়। নামটা তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া। এ যুগে বিয়ে হলে অনেক মেয়ে পদবীর সঙ্গে নামটাও পালটাতে বাধ্য হয়। পরের ঘরের মেয়ের মাথায় সিঁদুর দিয়ে নিজের ঘরে আনবার সময় তার ডাক নামটাকে পালটে রাখার রেওয়াজ ইদানীং কালের। ননীবালা এ-কালের মেয়ে নন। তাঁর গোত্রান্তর ঘটেছিল উনিশ শ' আটাশে—প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে। তবু ঐ খেতাবটা তখনই পেয়েছিলেন তিনি। একেবারে বধূবরণের আসরে।

ব্যাটা-ব্যাটাবৌ এসে সবে দাঁড়িয়েছে। ফুল দিয়ে সাজানো মোটর গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে অমৃত ব্যানার্জী রোডের বাড়ির সদরে। ছু পাশে সার দিয়ে খাশ-গেলাসের আলো। জগঝম্প আর ব্যাগ-পাইপে পাড়াটা সরগরম। আলপনা-আঁকা উঠোনে ছুধে-আলতায় পা রেখে দাঁড়িয়েছে নববধূ। হুলুধ্বনি আর শঙ্খনিনাদ। ব্যস্ত লোকজনের ছুটোছুটি। ওরই মধ্যে এগিয়ে এলেন মৃণ্ময়ী, সত্যবানের মা। বধূবরণ করতে হবে। বরণ করতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হল নব-বধূর নামটাই তাঁর জানা নেই। চন্দনচর্চিত আনত মুখখানি তুলে ধরে বললেন, তোমার নামটি কি বৌমা?

প্রথম শাশুড়ী সম্ভাষণ। নতনয়নে নববধূ অস্ফুটে বলে, শ্রীমতী

ননীবালা রায়।

উঠোনসুদ্ধ এয়ো-স্ত্রী অট্টহাসে ফেটে পড়ে : 'রায়' কি গো বৌমা ? রায় ছেড়ে রাতারাতি চক্কোত্তি হয়ে গেছ, জান না ?

মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছিল পঞ্চদশী প্রায় কিশোরীর। মৃণ্ময়ী ওর চিবুকটা পুনরায় তুলে ধরে বলেছিলেন, শুধু পদবী নয় বৌমা, নামটাও তোমার বদলে গেছে রাতারাতি। সত্যবানের ঘরে এসে তুমি হয়েছ : 'সাবিত্রী' !

এই 'সাবিত্রী-সত্যবান' মিলনান্ত নাটকের নায়িকা যদিচ সাবিত্রী, এবং শাস্ত্রসম্মত নায়ক সত্যবান চক্রবর্তী ; কিন্তু প্রধান ভূমিকা ও দুজনের কারও নয়। সে ভূমিকা ছিল প্রেসিডেন্সী কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক তারাপ্রসন্ন রায়ের। গল্পটা তাই সেদিন থেকে শোনাতে হয় :

অধ্যাপক তারাপ্রসন্ন রায় অঙ্কের অধ্যাপনা করেন। বিয়ে থা করেননি। থাকেন দাদার সংসারে। সংসারে তখন কুল্লে চারটি প্রাণী —দাদা, বৌদি, ননীবালা আর তিনি। দাদার বড় মেয়ে স্নেহবালার বিয়ে আগেই হয়ে গেছে। দাদা কালীপ্রসন্ন বস্তুত ধর্ম-কর্ম নিয়েই আছেন—মন্ত্র নিয়েছেন, একটু নির্লিপ্ত ধরনের। মোহ-মুদ্গরের প্রভাবেই হবে হয়তো—সংসার সম্বন্ধে একেবারে নির্লিপ্ত। পূজা-অর্চনা এবং গুরুভাইদের নিয়েই আছেন। ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের দায় দায়িত্ব ছোট ভাইয়ের, হোম-ডিপার্টমেণ্ট গৃহিণীর। বড় মেয়ে স্নেহবালার বিবাহ ওরা দুজনে মিলে কি করে দিয়েছিল সেটা আজও ঠাহর হয় না কালীপ্রসন্নের। স্নেহবালার চেয়ে ননী সাত বছরের ছোট। ননীবালার আবাল্য সঙ্গী তাই তার কাকামণি। কনভার্স থিয়োরেমটাও সিদ্ধ—অঙ্কশাস্ত্রে আকণ্ঠ নিমগ্ন তারাপ্রসন্নের একমাত্র সঙ্গীও ঐ একফোঁটা মেয়েটাই। দিদির বিয়ের পর থেকে বেচারি একা—মনমরা হয়ে কেঁদে কেঁদে ফিরত। তাই কাকামণি এগিয়ে এসেছিলেন তাকে সঙ্গদান করতে। কলেজ থেকে ফিরে তাই বৌদির

হেঁসেলে গিয়েই নিষ্কৃতি পান না, তারপর আহার করতে হয় মা-মনির ভাজা কাগজের লুচি, ইটের কুচির মেঠাই। তার পুতুলের অসুখ করলে চিকিৎসা করতে হয়। এমনকি মা-মণির অশ্বারোহণের বাসনা জাগলে এম. এস-সির পরীক্ষার খাতার অরণ্যসঙ্কুল পথে তাঁকে 'হেট ঘোড়া-হেট' হতে হয়।

ননীবালা বড় হল। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি। পড়াশুনায় তার কোন-দিনই মন নেই। এদিক থেকে সে 'শৈলটাকার ভাইঝি রাণু'। আজকাল আর তার পুতুলের অসুখ করে না। তার রান্নাঘরে কাগজের লুচি বাড়ন্ত। কলেজ থেকে তারাপ্রসন্ন ফিরে এলে সে এখনও যথা-রীতি ছুটে আসে। জুতোজোড়া খুলে নিয়ে চটিজোড়া এগিয়ে দেয়। কখনও কাকামণির কোল ঘেঁষে দাঁড়ায় : ইস্! কত চুল পেকে গেছে তোমার। বস দেখি স্থির হয়ে, পাকাগুলো তুলে দিই।

তারাপ্রসন্ন বলেন, পাকা চুল থাক। তুই বস্ দেখি এখানে। হ্যাঁরে মা-মণি, এই যে তুই লেখাপড়া করছিস না, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তোর কী হাল হবে ভেবে দেখেছিস ?

ননীবালা সে বিষয়ে কিছু ভেবে দেখেছে কিনা বোঝা যেত না। মুখে শুধু বলত : ধ্যেৎ!

কালীপ্রসন্ন আধা সন্ন্যাসী; কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর বিবেক মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। একদিন তিনি এসে হাজির হলেন ভাইয়ের ঘরে। বললেন, তারা, আর তো দেরী করা চলে না। ননীর বয়স চোদ্দ পেরিয়ে পনের হল। এবার তো তাকে পাত্রস্থ করতে হয়।

তারাপ্রসন্ন যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চান—গৌরীদানের যুগ পার হয়ে গেছে। বিংশ শতাব্দীর বয়স এখন আটাশ। রীতিমত সাবালক সে। তাছাড়া স্নেহবালার বেলায় তো দাদা এমন করেননি। সতের বছরে বিয়ে হয়েছিল তার। দাদা এসব যুক্তি শুনতে রাজী নন। বৌদিও দাদার দলে। তারাপ্রসন্ন একঘরে হয়ে পড়লেন, কারণ মা-মণি যে কোন্ দলে তা ঠাহর হল না। তার সেই ভদ্রলোকের এক

কথা : ধ্যেৎ!

সম্ভব-অসম্ভব নানান জায়গায় যখন দাদা সম্বন্ধ করতে থাকেন আর পঞ্চদশী ননীবালা বাইরের ঘরে এসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে অভ্যাগতদের কাছে পরীক্ষা দিতে শুরু করল তখন আর অধ্যাপক মশাই স্থির থাকতে পারলেন না। এবার তিনিই হাজির হলেন দাদার এজলাসে : শোন, মা-মণির জন্য একটি পাত্রকে আমি মনে মনে স্থির করে রেখেছি। খুবই ভাল পাত্র। তবে তাড়াহুড়ো করা চলবে না। একটা বছর সবুর করতে হবে।

: কেন? সবুর করতে হবে কেন?

: ওর এটা ফাইনাল ইয়ার। ফোর্থ ইয়ার। বি. এস-সি দেবে। অঙ্কে অনার্স। পরীক্ষার আগে ওর বাবা বিয়ে দেবে, না আমিও সেটা দিতে দেব না। ছেলেটি আমার খুব বাধ্য। ক্লাসের বেস্ট বয়!

: পালটি ঘর?

: হ্যাঁ। রাঢ়ীশ্রেণী। ভরদ্বাজ গোত্র। সব খোঁজ নিয়ে দেখেছি। ফার্স্ট ক্লাস পাবেই। এম. এস্-সিতেও নিশ্চয় ফার্স্ট-সেকেণ্ড হবে। প্রফেসারি বাঁধা। আই. সি. এস্. দেবে কিনা জানি না। অসাধারণ মেধা ছেলেটির—

বৌদি বলেন, মেধা ধুয়ে জল খাব? বাড়ি ঘর কিছু আছে? একান্নবর্তী পরিবার?

: বাড়ি আছে। পৈতৃক। অমৃত ব্যানার্জী রোডে—কালীঘাটে। ছোট সংসার। বাপ মা আছেন। দুই বোন—তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। দায় ঝক্কি নেই। বাপের এক ছেলে।

কালীপ্রসন্ন বললেন, তাহলে তো সব দিক থেকেই সোনায় সোহাগা। কিন্তু ঐ একটি বছর সবুর করতে আমি পারব না, তারা। এই জ্যৈষ্ঠেই বিয়ে দিতে হবে। আমি ওর কোষ্ঠী বিচার করে দেখেছি—

বাধা দিয়ে তারাপ্রসন্ন বলেছিলেন, সে অসম্ভব। এটা ওর

ফাইনাল ইয়ার। ওর বাবা রাজী হবেন না। আমিও চাই না অমন একটি ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ারেব ছেলেকে—

এবার দাদাই ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দেন, বিয়ে করলেই ফেল মারবে তার কি মানে ?

: সে তুমি বুঝবে না দাদা।

. তুই একবার বলেই দেখ না?

: না। যে ব্যাপারে আমার নিজেরই সায় নেই সে বিষয়ে অন্যায় অনুরোধ কবতে পারব না আমি।

কালীপ্রসন্ন অত সহজে হাল ছাড়তে রাজা নন। নাম-ঠিকানা সংগ্রহ কবে নিজেই হাজির হয়েছিলেন সত্যবানের বাবার কাছে। প্রথমেই কোষ্ঠীবিচার। বাজঘোটক হল। কিন্তু সত্যবানেব বাবা বললেন, আপনার কন্যাটিকে এ-ঘরের বধূ করে নিয়ে আসতে আমার কোনই আপত্তি নেই, আগ্রহ আছে। কত বড় বংশ আপনাদের। তাছাড়া আপনার ভাই সতুর গুরু। কিন্তু রায়মশাই, আপনাকে বছর তিনেক সবুর করতে হবে—

: তিন বছর ! কেন ? তিন বছর কেন ? ওর পরীক্ষা তো আগামী বছরেই—

: আজ্ঞে না। এম. এস্-সি পাস করার পূর্বে ওকে সংসারে আবদ্ধ করতে চাই না আমি।

: কেন চক্কোত্তি মশাই ? আপনার পুত্রবধূকে তো তার স্বামীর উপার্জনেব উপব নির্ভব করতে হবে না। আপনিই তো আছেন ?

: সে জন্য নয়। Mathematics is a stern mistress ! সে সতীন সইতে পারে না। আমি নিজেও অঙ্কে অনার্স নিয়েছিলাম। অনার্স রাখতে পারিনি। বাবা জোর করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন বলে। ঘরপোড়া গরু মশাই, তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরাই—

হা হা করে হেসে উঠেছিলেন নিজের রসিকতায়। দিলদরাজ মানুষ তিনি। নিজের জীবনের স্বপ্ন পুত্রের জীবনে সার্থক করতে

চান। এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রাগ করেই ফিরে এসেছিলেন কালীপ্রসন্ন। তিন তিনটে বছর সবুর করা সম্ভব নয়। ননীবালার কেষ্ঠীবিচার করে দেখেছেন—এই জ্যৈষ্ঠের মধ্যেই বিবাহ না হলে তার বৈধব্যযোগ !

এই নিয়েই মতান্তর। তা থেকে মনান্তর। অবস্থা চরমে উঠল যখন কালীপ্রসন্ন কাশী থেকে ফিরে এসে ঘোষণা করলেন, আর কাউকে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না ; কন্যার বিবাহ তিনি পাকা করে এসেছেন। তবু মাথা ঘামাতে হল। কাউকে কিছু না জানিয়ে কেমন পাত্র স্থির করে এলেন আধা সন্ন্যাসী কালীপ্রসন্ন ? শোনা গেল—পাত্রটির কিঞ্চিৎ বয়স হয়েছে—বেশি নয়, ত্রিশ-বত্রিশ। প্রথম স্ত্রী মারা গেছে বছর দুই—একটি কন্যাসন্তান রেখে। তাকে মানুষ করার জন্যই এই দ্বিতীয় বিবাহের আয়োজন। স্কুলের গণ্ডি যদিচ পার হয়নি ছেলেটি, তবে অর্থাভাব আদৌ নেই। বস্তুত পাত্রের বাবা মজুমদার মশাই ভেলুপুরা অঞ্চলের একজন রহিস্ আদমী। এখনও প্রতি শনি-রবিবার তাঁর বাড়িতে গানবাজনার আসর বসে। বিকল্প-মার্গে সারস্বত-সাধনা অব্যাহত রেখেছে মজুমদার পরিবার। ছেলেটি ভাল তব্‌লা বাজায়। তেজারতি কারবারে ভেলুপুরা অঞ্চলের অনেকানেক পাকা-মাথা মজুমদার মশায়ের খেড়ো খাতার লাল সুতোয় বাঁধা।

সমস্ত বিবরণ শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন তারাপ্রসন্ন। দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে গৃহত্যাগ করলেন। বইখাতার বাণ্ডিল নিয়ে গিয়ে উঠবেন সিমলে স্ট্রীটে এক বন্ধুর মেস-এ। আশ্চর্য, দেখা গেল বৌদিও দাদার দলে। পাত্রপক্ষের রবরবার কাহিনীতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। রাজরানী হতে বসেছে নাকি ননীবালা। তারাপ্রসন্ন সুটকেশ গুছিয়ে নিতে নিতেই কালীপ্রসন্ন বিষোদ্গার করলেন, জানি, জানি, এখনই তো সরে পড়ার মাহেন্দ্রক্ষণ ! কন্যাদায়গ্রস্ত দাদার কাঁধে সব দায়-ঝক্কি ঝেড়ে ফেলে এই তো পালাবার সময়।

রুখে উঠেছিলেন তারাপ্রসন্ন : হাত পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেবে, আর তাই দাঁড়িয়ে দেখব ?

: কেন, দোজবরের কি বিয়ে হয় না ?

: কিন্তু ওর যে ডবল বয়স ! একটা আকাট মূর্খ—স্কুলের গণ্ডিও পার হয়নি···

: লেখাপড়া নিয়ে কি ধুয়ে খাব ? ওরা কত বড়লোক জানিস ?

: না, জানি না। জানতে চাইও না। তোমাদের মেয়ে, তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার। আর আমি কিছু দেশত্যাগী হচ্ছি না। সিমলে স্ট্রীটে পাঁচুগোপালদের মেসে থাকব। নেহাত দরকার পড়লে খবর দিও ; কিন্তু বিশ্বাস কর দাদা—চোখের উপর এ দৃশ্য আমি দেখতে পারছি না।

কালীপ্রসন্ন চিৎকার করে ওঠেন, মরে গেলেও খবর দেব না। কী ভাবিস তুই ? তোর দাদা একা হাতে পারবে না ? দেখে নিস ! একা হাতেই সব করব আমি। দুধ-কলা দিয়ে কী ভাই-ই পুষেছিলাম···।

মরণাহত দৃষ্টিতে নির্বাক তাকিয়ে থাকেন তারাপ্রসন্ন।

কণ্ঠে মধু ঢেলে বৌদি বলেন, ও আবার কি কথার ছিরি ? দরকার হবে বইকি ঠাকুরপো। ঠিকানাটা বলে গেলে, ভালই হত। ওখানেই তাহলে নেমন্তন্ন পত্রটা দিয়ে আসবে তোমার দাদা। এস কিন্তু সেদিন। সামান্য আয়োজন—তোমার দাদার তো রোজগার নেই ; তবু যা-হোক দুটো মুখে দিয়ে যেও।

শেলের মত বিঁধল কথাগুলো অকৃতদার দেবরের বুকে। ইচ্ছে ছিল যাবার আগে সেই হতভাগীটার সঙ্গে একবার নিভৃতে দেখা করবেন। এ কথায় সে সংকল্পও ত্যাগ করলেন। বই-এর বাণ্ডিল আর সুটকেশ নিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন রাস্তায়।

ছাদে, গঙ্গাজলের টাঁকিটার আড়ালে তখন ননীবালা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সদর দরজা খোলার শব্দ পেয়েই সে ঝুঁকে

পড়ল কার্নিস্ থেকে। দেখে, বইয়ের ভারে তার কাকামণি একটু ঝুঁকে পড়েছেন। হনহনিয়ে গলিটা পার হয়ে ট্রাম-রাস্তার জনারণ্যে মিশে গেলেন। একবারও পিছন ফিরে দেখলেন না, ছাদে তাঁর মা-মণি একা দাঁড়িয়ে আছে।

তবু অঙ্কটা যখন কিছুতেই মেলাতে পরেলেন না তখন বাধ্য হয়ে সেই সিমলে স্ট্রীটের মেসেই ছুটে এলেন কালীপ্রসন্ন। মুখচোখ বসে গেছে, যেন মহাগুরু নিপাতের সংবাদ জানাতে এসেছেন ভাইকে। তারিখটা মনে আছে। সকাল থেকেই উশখুশ করছেন। যাবেন কি যাবেন না—এমন সময় হঠাৎ দাদাকে দেখে আঁৎকে ওঠেন: কী হয়েছে দাদা?

চৌকাঠের দু-দিকে দুহাত দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন প্রবেশপথে। হঠাৎ হু-হু করে কেঁদে ফেললেন। তারাপ্রসন্ন ছুটে এলেন। দাদার হাত ধরে বসিয়ে দিলেন চৌকিতে। বলেন, এমন করছ কেন? কী হয়েছে?

: তুই ঠিকই বলেছিলি, তারা! মেয়েটাকে আমি বোধহয় হাত-পা বেঁধে গাঙের জলেই ভাসিয়ে দিলুম! ওহ্!

: কেন? কী হল? আজই তো বিয়ে!

: চামার! চামার সব! কিন্তু এখন আমি কি করি? আমি কি আত্মঘাতী হব!

: শুধু পাগলামিই করবে, না খুলে বলবে আমাকে?

: এখন আর খুলে বলে কী হবে? তুই-ই বা এ অবস্থায় কী করতে পারিস? ভবিতব্য···

ভবিতব্য বলে এতবড় অন্যায়টা মেনে নিতে পারেননি অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক। আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ শুনে বলেছিলেন, ঠিক আছে। তুমি বাড়ি যাও। যা করার আমিই করব। হাওড়া স্টেশনে আমিই যাচ্ছি। যেমন করে পারি, হাতে পায়ে ধরে ওঁদের নিয়ে আসব···

: পারলে তুই-ই পারবি। তাই তোর কাছেই ছুটে এসেছি। কিন্তু তুই কি একা যাবি? ওরা আছে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে। বর, বরের কাকা, বাবা…

: হ্যাঁ একাই যাব আমি। ওঁরা যে শেষ মুহূর্তে এই মোচড় দিচ্ছেন সে কথা কে কে জানে?

: পিসেমশাই, নিবারণ আর আমি। বাড়িতে খবরটা জানাইনি। মানে, তোর বৌদিও জানে না।

: ভালই করেছ। কাউকে কিছু বোলো না। সন্ধ্যাবেলা বর নিয়ে আসব আমি।

: কিন্তু ঐ বাড়তি হাজার টাকা? আমার তো এখন…

: বললাম না—সব দায় দায়িত্ব আমার। তুমি বাড়ি যাও। বিয়ের আয়োজন কর। সন্ধ্যালগ্নে বর নিয়ে আসব আমি।

কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে কালীপ্রসন্ন ফিরে গেলেন, আর কন্যাদায়গ্রস্ত সংসারানভিজ্ঞ দাদার সব বোঝা কাঁধে নিয়ে তাঁর ছোট ভাই তখনই রওনা দিলেন ট্যাক্সি নিয়ে। না, হাওড়া স্টেশন-মুখো নয়—কালীঘাটে, অমৃত ব্যানার্জী রোডে।

সত্যবানের বাবা রাশভারি মানুষ। বাইরের ঘরে একা ইজি-চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। পুত্রের অধ্যাপককে আসতে দেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠেন, আসুন, আসুন প্রফেসর রায়। খোকা বাড়িতেই আছে, ডেকে দিই?

: আজ্ঞে না। প্রয়োজনটা আপনার সঙ্গেই এবং কথাটা গোপনীয়।

ভ্রূকুঞ্চিত হয় চক্রবর্তীমশায়ের। অধ্যাপক তারাপ্রসন্নকে তিনি চেনেন। দেখেছেন কলেজে। আই. এস্ সি-তে খোকা যখন ব্রিলি-য়াণ্ট রেজাল্ট করল তখন একবার নিজে থেকেই এসেছিলেন। তার পর এই আসা। ভিতরের দরজাটা বন্ধ করে ঘনিয়ে এসে বলেন, বলুন?

: আমার দাদা মাসখানেক পূর্বে একবার আপনার কাছে এসেছিলেন, নয় ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সঙ্গে খোকার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে। তা আমি বলেছিলাম—

: জানি। আমিও সেদিন আপনার সঙ্গে একমত ছিলাম। বস্তুত এ নিয়ে দাদার সঙ্গে আমার মতান্তর হয়। দাদা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাশী-প্রবাসী এক বাঙালী ভদ্রলোকের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে ননীর বিবাহ পাকা করে আসেন। তাঁতে আমার মত ছিল না। অনেকগুলি কারণে। পাত্রটি ননীর ডবল বয়সের, দোজবরে, একটি কন্যাও আছে, সে ম্যাট্রিকটাও পাস করেনি। শেষ পর্যন্ত এই নিয়ে দাদা-বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাই।

বাধা দিয়ে চক্রবর্তী বলেন, এসব পারিবারিক কথা আমাকে বলছেন কেন প্রফেসর রায় ?

: গল্পটা শেষ হলেই বুঝবেন। অঙ্কটা শক্ত। কী ভাবে সলভ হবে বুঝে উঠতে পারছি না। আপনার একটু পরামর্শ চাই। আগে গল্পটা শুনুন।

অতঃপর সেই কাহিনী সবিস্তারে শুনিয়েছিলেন :

গত এক মাস ধরে কাশী-প্রবাসী ভদ্রলোক নাকি ক্রমাগত মোচড় দিয়ে চলেছেন। কালীপ্রসন্ন ভালোমানুষ। ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। প্রাথমিক দাবী ইতিমধ্যেই দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই হবু-বেহাই হেসে হেসে অভিযোগ করেছেন—আপনি কি ছেলেমানুষ ? এ কথা কি আবার বুঝিয়ে বলার ? বোতাম মানেই তো হীরের বোতাম ! আর নমস্কারীর অর্থ বয়স্কাদের গরদ এবং অল্পবয়স্কাদের বেনারসী—এসব কথা কি বলতে হবে নাকি ? বরযাত্রীদের সংখ্যাটা মাত্রাতিরিক্ত হলেও সেটা মেনে নিয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন, ভাড়াটাও দিতে রাজী হয়ে আসেন ; কিন্তু তখন বুঝতে পারেননি সকলকেই যাতায়াতের ফার্স্ট ক্লাস ভাড়া দিতে হবে ! সে জন্য দায়ী

কন্যাকর্তার মূর্খামি : বাঃ! বর বরকর্তা ফার্স্ট ক্লাসে যাবে, আর তার আত্মীয়-কুটুম কি সেকেণ্ড বা ইণ্টারে যেতে পারে? তাঁদের ইজ্জৎ আছে না? নাপিত চাকর? তারা যদি কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গেই না থাকল তবে তাদের আসার অর্থ? গাড়িতে খিদমৎ করবে কে? তামাকটা সেজে দেবে কে?

উপায়ান্তরবিহীন কালীপ্রসন্ন একে একে সবই মেনে নিয়েছিলেন। বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র বিলি হয়ে গেছে। আত্মীয়-কুটুম্ব আসতে শুরু করেছে। এখন পিছিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। স্ত্রীকে লুকিয়ে বসতবাড়ির নিজ অংশটা বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করেছেন। যেমন করেই হোক এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতেই হবে। কিন্তু উটের পিঠে শেষ বোঝার আঁটিটা বইতে পারলেন না তিনি। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন আচমকা।

ভোরবেলা বরযাত্রীরা এসে পৌঁছেছেন হাওড়া স্টেশনে। তাদের স্টেশনে অভ্যর্থনা করে আনতে এ পক্ষ থেকে গিয়েছিলেন কালী-প্রসন্নের পিসেমশাই আর বড় জামাই নিবারণ। বিয়েবাড়ির অদূরে একটি স্কুলবাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। কথা ছিল স্টেশন থেকে বরযাত্রীরা সোজা সেখানে গিয়েই উঠবে। এখন গ্রীষ্মের ছুটি, স্কুল বন্ধ। আপ্যায়নেব যাবতীয় ব্যবস্থা সেখানে করে রাখা হয়েছে। বেয়াই মশায়ের নির্দেশ অনুযায়ী ফুল দিয়ে সাজানো মোটর গাড়ি এবং চিৎপুরের ব্যাণ্ড পার্টি সেই স্কুলবাড়িতে এসে পৌঁছবে বিকেল বেলায়। তারপর শর্ত অনুযায়ী শোভাযাত্রা করে স্কুলবাড়ি থেকে বিয়েবাড়িতে আসবে বরযাত্রীদল।

কিন্তু হবু-বেয়াই বেঁকে বসলেন, সে কী! ফুল-দিয়ে-সাজানো গাড়ি কই? ব্যাগ্‌পাইপ কই? খাশ-গেলাসের আলো কই?

পিসেমশাই যুক্তকরে নিবেদন করেন, বেই মশাই, সব ব্যবস্থাই করা আছে। বর যখন বিয়ে করতে যাবে তখন এসবই থাকবে। এই জ্যৈষ্ঠের গরমে সকালবেলা হাওড়া স্টেশনে সেসব কোথায় পাবেন?

গতরাত্রের খোঁয়াড় তখনও ভাঙেনি। বেয়াইমশাই বলেন, উহুঁ, এমন কথা তো ছিল না। কথা ছিল সাজানো গাড়ি আর ব্যাণ্ড পার্টির। সে ব্যবস্থা না হলে পাদমেকং ন গচ্ছামি। কি বল মিত্তির?

মোসাহেব মিত্তির ঘন ঘন মাথা নাড়ে: ন্যায্য কথা হুজুর। ভেলুপুরার মজুমদার মশায়ের ব্যাটার বে! চাট্টিখানি কথা!

: তাই বল কেন? তোমরাই বল—আমি কি অন্যায্য দাবী করছি?

: কোন শালা বলে!

নিবারণ আর পিসেমশাই তখন খুঁজতে থাকেন বরযাত্রীদলে পানাসক্ত কে কে নন। ছিলেন কেউ কেউ। অল্পই। তাঁরা বলেন, বাপ্‌স্! কর্তার মুখের উপর কথা বলব?

নিবারণ রাগ করে বলেন, এটুকু তো বোঝেন এটা কলকাতা শহর! এখানে প্রসেশন করতে হলে পুলিস কমিশনারের অনুমতি লাগে?

: তবে তাই নিয়ে আসুন। আমরা অপেক্ষা করছি!

দাঁতে দাঁতে চেপে পিসেমশাই বলেন, সেটা যে অসম্ভব ত নিশ্চয়ই বুঝছেন—

এগিয়ে আসেন বরের বাবা—ভেলুপুরার রহিস্‌আদমী। এক-জোড়া রক্তচক্ষু মেলে বলেন, শুনুন মশাই! শেষ কথা বলছি! দুটো রাস্তা আছে। বেছে নিন ইচ্ছেমতো। এক নম্বর: সাজানো গাড়ি আর ব্যাণ্ড পার্টি নিয়ে আসুন হাওড়া স্টেশনে। আমরা ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছি। দু নম্বর: কথার খেলাপ হয়েছে স্বীকার করে বেই-মশাইকে ক্ষমা চাইতে হবে—

পিসেমশাই যুক্তকরে বলেন, তাই না হয় চাইছি···

: আপনি কে হে মশাই, হরিদাস পাল? বেইকে চাই, বুয়েছেন? বেইমশাই! সেই জোচ্চোরটা এসে আমার আত্মীয়স্বজনের কাছে ক্ষমা চাক—আমার কাছে নয়, আমি এসব ছোট কথায় কান দি'না।

অ্যাই এঁদের কাছে···হ্যাঁ। আর খেসারত বাবদ হাজার টাকা মূল্য ধরে দেবেন? বুঝেছেন?

পিসেমশাই স্তম্ভিত। এ কী জাতের মানুষ?

রহিস আদমী তখনও টলছেন: বুঝেছেন মিস্টার হরিদাস পাল? হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না! হয় শর্ত পুরণ, নয় জরিমানা। বেছে নিন। না-হলে এখান থেকেই বেনারস ফিরে যাব আমরা। ভেলুপুরার খগা মজুমদার এক কথার মানুষ—হ্যাঁ!

পিসেমশাই দাঁতে দাঁত চিপে বলেন, বেশ, সে-কথাই জানাই গিয়ে মেয়ের বাবাকে!

: অ্যা—অ্যাই! এতক্ষণে মিস্টার হরিদাস পালের বুদ্ধি খুলেছে!

সমস্বরে হেসে ওঠে মোসাহেবের দল।

নিবারণচন্দ্র আর পিসেমশাই ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এসেছিলেন বিয়েবাড়িতে। কথাটা পাঁচকান করেননি। গোপনে জানিয়েছিলেন কন্যাদায়গ্রস্ত হতভাগ্যের কর্ণমূলে। আর তখনই আঁধার ঘনিয়ে এসেছিলো ধর্মভীরু মানুষটির দুচোখে। বিপদে-আপদে চিরকাল যা করেছেন স্বভাবধর্মবশে সেটাই করে বসলেন। উন্মাদের মত ছুটে গিয়েছিলেন ছোট ভাইয়ের কাছে। সমস্যার সমাধানের সন্ধানে নয়, প্রাণখুলে কাঁদতে। ভাইকে বুকে টেনে নিয়ে শুধু বলতে: এ আমি কী করলাম! এ আমি কী করলাম!

কাহিনী শেষ করে তারাপ্রসন্ন মুখ তুলে তাকালেন। সত্যবানের বাবা ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। উত্তেজনায় ঘরময় পায়চারি করছেন। অস্ফুটে স্বগতোক্তি করছেন আপন মনে: আশ্চর্য! এমন চামারও আছে ব্রাহ্মণকুলে?

: চক্কোত্তিমশাই?···

: ঠিক আছে, ঠিক আছে। ব্যবস্থা একটা হবেই। দেখছি আমি···

ভিতরের দরজা খুলে অন্দরের দিকে ফিরে হাঁক পাড়েন: খোকা! খোকা!

অনতিবিলম্বে কোঁচার খুঁট গায়ে জড়িয়ে এসে দাঁড়ায় একটি একুশ বছরের তরুণ। মাস্টারমশাইকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে এগিয়ে আসে। প্রণাম করে বলে, ভাল আছেন স্যার ?

তারাপ্রসন্ন জবাব দেবার পূর্বেই চক্রবর্তী প্রশ্ন করেন, খোকা, সকালে কি খেয়েছিস ?

কঠিন প্রশ্ন ! সাইমেলটেনাস ইয়োয়েশনে ছটো রুট, ছটো আননোন। এক নম্বর : 'এক্স'—মাস্টার মশায়ের আবির্ভাব। ছ-নম্বর : 'ওয়াই'—সকালে সে কি খেয়েছে। ওয়াইটাকেই আক্রমণ করল প্রথমে : চা আর হালুয়া।

: বেশ করেছিস। ওতে দোষ নেই। আর কিছু খাস নে। ইয়ে, আজ তোর বিয়ে। চুলটা কেটে আয়, আর রেডিমেড সিল্কের পাঞ্জাবি, ধুতি, গেঞ্জী, জুতো সব কিনে নিয়ে আয়। বন্ধু-বান্ধব কাছেপিঠে যাকে পাবি নেমন্তন্ন করে আসবি, বরযাত্রী যাবে···

এক্স-ওয়াই ছটো রুটের ভ্যালুই এখন জানা হয়ে গেছে। তবু···

: কী রে ব্যাটা ? হাঁ করে কি দেখছিস ? ওঁকে আর একটা পেন্নাম কর। মাস্টার-মশাই হিসাবে নয়, এবার খুড়শ্বশুর হিসাবে।

বিয়েবাড়ির সে অনুষ্ঠানও রীতিমত নাটকীয়।

: ওমা ! ও বৌঠান ! তবে যে বলেছিলে দোজবরে বুড়ো ? এ যে কার্তিক গো ?

মৃণ্ময়ী বেনারসীর আঁচলে চোখ মুছে বলেন, ভুল শুনেছিলুম ঠাকুরঝি—শুধু তাই নয়, জামাই আমার বি. এস্-সি পড়ছে।

নাটকের ক্লাইম্যাক্স এক প্রহর রাতে। যখন একসার ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো অমৃত ব্যানার্জী রোডে। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে স্বয়ং যমরাজ যেন আবির্ভূত হলেন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। সারাদিন অপেক্ষা করে করে জ্যৈষ্ঠের ভ্যাপসা গরমে মেজাজ সব টং। ততক্ষণে মদের প্রভাবটাও কেটেছে। এতবড় সাহস ! সাতসকালে সেই ছুই বাপ্পোৎ দেখা করতে এসেছিল, তারপর আর কোন শালার টিকিটি

দেখা যায়নি ! ওঁরা তাই বলে অভুক্ত নেই সারাদিন। চর্ব্যচুষ্য মধ্যাহ্ন আহার সেরেছেন কেলনারে। ভাউচারগুলো যত্ন করে রেখেছেন বুক-পকেটে—বেই-মশাইকে হস্তান্তর করে খেসারত আদায় করতে হবে। কলকণ্ঠে ট্যাক্সির ঝাঁক যখন এসে পৌছলো, উঠোনে তখন স্ত্রী-আচার হচ্ছে। এয়োস্ত্রীর দল তখন এক জটিল অঙ্কে গলদঘর্ম—অন্তত তখন তাই মনে হয়েছিল সত্যবানের—যে সুতো দিয়ে ওঁরা তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপছেন সেটা দাগ কাটা নয়। না সি. জি. এম. য়ুনিটে না ফুট-ইঞ্চিতে। এ অঙ্ক ওঁরা কেমন করে মেলাবেন জানে না সত্যবান—আই. এস্. সি-তে অঙ্কে যে দুশয় একশ ছিয়ানব্বই পেয়েছে !

ভেলুপুরার রহিস আদমি ট্যাক্সি থেকে নেমেই সিংহগর্জনে হুঙ্কার ছাড়েন, কোথায় সেই জোচ্চোর ? কালীপ্রসন্ন চক্কোত্তি, না কি যেন নাম ?

সেদিক থেকে পাড়ার ছেলেরা বলতে হবে খুবই ভদ্র। ওরা মারধর করেনি আদৌ। শুধু তারাপ্রসন্ন যখন ছুটে এসে বললেন, একি ? কাছা খুলে দিচ্ছ কেন ওঁদের ? তখন দলপতি অসীম শুধু বলেছিল, না স্যার, কাছা নয়, কাপড়টা। আপনি ভিতরে যান। কথা দিচ্ছি মারধোর করব না আমরা।

কথা রেখেছিল তারা। ভেলুপুরার রহিস আদমী সদলবলে হাওড়া স্টেশনে ফিরতে বাধ্য হয়েছিল আণ্ডার ওয়্যার পরে। উৎসব-মুখর নিজের বাড়িতে তিনি কী বেশে ফিরে গিয়েছিলেন, কেন ওরা বিয়ে দিল না সে কৈফিয়ত কা ভাবে দিয়েছিলেন তার কোন ইতিহাস জানা যায় না।

ফুলশয্যার আয়োজন হয়েছিল ছাদের চিলেকোঠার ঘরে।

মাত্র দশ ঘণ্টার নোটিশে ছেলের বিয়ে দিতে হয়েছে। আয়োজন কিছুই করতে পারেন নি। মুখে মুখে যে কজনকে বলতে পেরেছেন, আর পাড়ার লোক—এই নিয়েই বৌভাত। সত্যবানের দুই দিদিই

শ্বশুরবাড়িতে, কলকাতার বাইরে—আর্জেন্ট টেলিগ্রাফ গেছে। দুজনের একজনও এসে পৌঁছতে পারেনি। ফুলশয্যার তত্ত্ব নিয়ে স্নেহবালা আর নিবারণ নিজেরাই এসেছিল। পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে সেই চিলেকোঠার ঘরখানি ফুলে ফুলে সাজিয়েছে। মৃণ্ময়ী আর থাকতে পারেননি, কালীপ্রসন্নকে বলেছিলেন, আমার মেয়েরাও তো এসে পৌঁছল না। আপনার বড় মেয়েকে তাই আটকে রাখছি বেইমশাই। না হলে ফুলশয্যার অনুষ্ঠানগুলো করাবে কে ?

কালীপ্রসন্ন বলেন, বিলক্ষণ ! নিশ্চয়ই ! বড় খুকি আজ রাতে এখানেই থেকে যাক।

দাদার অনভিজ্ঞতায় ভুল শোধরাবার দায় চিরকালই নিতে হয়েছে তারাপ্রসন্নকে। তিনি তৎক্ষণাৎ কথাটা ঘুরিয়ে নেন, বেয়ান-ঠাকরুন, আপনার হিসাবে একটু ভুল হল। দাদার বড় মেয়ের সম্বন্ধে ও কথা বলার অধিকার না আছে দাদার, না আছে আমার। স্নেহ-বালার মালিক তো এখানেই হাজির। কথাটা তাকেই বলুন।

মৃণ্ময়ী সামলে নেন। বলেন, সে তো বটেই। নিবারণ এখন আমার ঘরের ছেলে হয়ে গেছে। সেই তো সব কিছু করছে। কি বল নিবারণ, স্নেহ আজ রাতে এখানেই থেকে যাবে তো ?

নিবারণ মজুমদার তুখড় ছেলে। চোখে-মুখে কথা তার। এক্স-সাইজ সাব-ইন্সপেক্টর। চালু মাল। টুলের উপর দাঁড়িয়ে পেরেক ঠুকছিল সে—ফুলের মালাটা টাঙাতে। এ কথায় সে নেমে আসে। সলজ্জে ঘাড় চুলকে বলে, বলছেন ? তা আমি কি রাতে ও বাড়িতে ফিরে যাব ?

সবাই উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে। মৃণ্ময়ী আঁচলে মুখ লুকিয়ে বলেন, তাই কি বলতে পারি ! তুমিও থাকবে। বৌ ছেড়ে তুমি শ্বশুরবাড়িতেই বা একা ফিরবে কেন ?

লাজুক-লাজুক মুখে নিবারণ বলে, আপনি যখন আদেশ করছেন মাঐমা তখন···

বৌভাতের নিমন্ত্রণ রাখতে সত্যবানের গুটি আট-দশ সহপাঠী এসেছিল। অধিকাংশকেই খবর দেবার সুযোগ ঘটেনি। তাদের যত্ন করে খাওয়াচ্ছিলেন স্বয়ং অধ্যাপক তারাপ্রসন্ন। তিনি কনের ঘরের কাকা, বরের ঘরের গুরু। বললেন, কী? তোমরা সব চেয়েচিন্তে খাচ্ছ তো? লজ্জা কোরো না যেন।

একজন মুখফোঁড় ছাত্র বললে, না স্যার, আজ আমরা লজ্জা করতে যাব কোন্ দুঃখে? আমাদের হয়ে লজ্জা করার দায়িত্বটা আজকের জন্য সত্যবানই নিয়েছে যে!

হাসলেন তারাপ্রসন্ন। বলেন, সতুর বউ কেমন হল? তোমরা কি বলছ?

রসগোল্লাটা গলাধঃকরণ করে আর একটি ছেলে বলল স্যার, ভগবান বড় একচোখো! বরাবরই দেখছি সব নম্বরগুলোই ওর খাতায় ঢেলে দেন। আজ আবার…

সঙ্কোচ নয়, সঙ্কোচের একটা অভিনয় করে মাঝপথে থেমে যায়। হাজার হোক, উনি স্যার! তার উপর আজ থেকে সত্যবানের খুড়শ্বশুর!

কিন্তু আজ যেন তারাপ্রসন্নও ছেলেমানুষ হয়ে গেছেন। আজ বড় আনন্দের দিন তাঁর। দুজনকেই বড় ভালবাসতেন তিনি—মা-মণি আর সত্যবান। দুটি হাত মিলিয়ে দিয়েছেন। তাই স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্যত্যাগ করে বলেন, বাট বয়েজ, হ্যাভ য়ু নোটিসড্ ওয়ান থিং? একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ তোমরা? ফর্মুলাটা কিভাবে বদলে গেল?

: না স্যার? কিসের ফর্মুলা?

: $x^2+y^2=a^2$ কেমন বেমক্কা হয়ে গেছে $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$?

সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বৌভাতের নিমন্ত্রণে এ আবার কোন্ জাতের অঙ্ক?

তারাপ্রসন্ন গম্ভীর হয়ে বলেন, বুঝলে না? সত্যবান এতদিন

ছিল সার্কেল, বৃত্ত। তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল 'ম্যাথ্‌মেটিক্স'। আজ থেকে সে চেপটিয়ে হল ইলিপ্স্‌, উপবৃত্ত! তার জীবনপথে এখন ছু-ছুটো ফোসাই! তাই নয়?

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল ওরা।

শেষ নিমন্ত্রিতটি বিদায় নেবার পরে বাড়ির লোকের খাওয়াও মিটল। মধ্যরাত্রে সব মিটিয়ে চিলেকোঠার ঘরে উঠে এল সত্যবান। আশা করেছিল, আর কেউ না হলেও অন্তত স্নেহবালা ওকে সেই ঘরের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যাবেন। ছুটো ঠাট্টা রসিকতা করবেন। ছুই দিদির একজনও এসে পৌঁছাতে পারেনি। পাড়ার বৌদি, মাসি-মার দলও বিদায় নিয়েছেন। ভাবল, সারাদিনের ধকলে স্নেহবালাও হয়তো ক্লান্ত। শুয়ে পড়েছে কোথাও। ফুলে-ফুলে-ভরা বিছামায় বসেছিল ওর বৌ। লাল টুকটুকে বেনারসী পরে। গায়ে থরে থরে অলঙ্কার, কপালে চন্দন, গলায় মোটা জুঁইয়ের মালা। মাথায় ওড়না। নত নয়নে চুপটি করে বসেছিল বালিকা বধূ।

তখনও ইলেকট্রিক আসেনি ওদের বাড়িতে। জ্যৈষ্ঠ মাস। গরম বেশ আছে। সত্যবান প্রথমেই খুলে দিল দক্ষিণদিকের জানলাটা। সেদিকে বাড়ি নেই। ফাঁকা মাঠ। অসুবিধা নেই কিছু জানলা খুলে শোবার। তারপর দরজাটা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিল। এদিকে ফিরতেই দেখে নতনয়না মেয়েটি মুখ তুলে তাকিয়েছে। সত্যবান অবাক হয়ে দেখে নববধূ তর্জনীটা তুলেছে ওষ্ঠের উপর। কী ব্যাপার? ব্যাপাব বোঝা গেল পরমুহূর্তেই। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ওর বালিকাবধূ নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল পালঙ্কের নিচে।

ও! এই ব্যাপার! তাই দিদি এমন সময়ে নিরুদ্দেশ!

সত্যবান মুখ টিপে বলে, খাটের নিচে একটা বেড়াল ঢুকেছে মনে হচ্ছে! র'স, ওটাকে আগে তাড়াই। মশারির ছত্রিটা খুলে দাও তো!

সব জারিজুরি খতম। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে হল স্নেহবালাকে। সত্যবানকে ছেড়ে আক্রমণ করল ভগ্নীকেই : ছুটকি! তুই নিশ্চয়ই বলে দিয়েছিস! ও হাঁদারাম কিছুতেই সন্দেহ করত না!

সত্যবান বললে, নিশ্চয়ই করতাম না। আমি ভেবেছিলাম, দিদির হামা দেওয়ার বয়স পার হয়ে গেছে। স্বচক্ষে না দেখলে নিশ্চয়ই মানতাম না। এখন বিদায় হন দিকিন।

স্নেহবালা সটান শুয়ে পড়ে ফুলে-ভরা খাটে। বলে, ইস্! কক্ষনো নয়। ক্ষমতা থাকে আমাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাও ছুটকির চোখের সামনে দিয়ে।

সত্যবান বলে, ষাট বালাই! শ্বশুরমশাই তাঁর একটি কন্যাকেই বি-পুর্বক বহন করতে বলেছেন। আপনাকে কেন বইব? একটু অপেক্ষা করুন দিদি, আমি এখনি নিবারণদাকে ডেকে আনি। তাঁকে বললেই হবে, ফুলের বিছানা দেখে দিদি আবার নতুন করে ফুলশয্যা যাপন করতে চান।

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে স্নেহবালা। বলে, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! জান, আমি তোমার দিদি হই! তোমার গুরুজন!

: ভাগ্যি মনে করিয়ে দিলেন! আপনার ব্যবহারে আমি তো ভাবছিলাম আপনি ওর ছোট বোন!

দুম্ দুম্ করে পা ফেলে বিদায় হল স্নেহবালা। দরজা বন্ধ করে এবার ফিরে এল সত্যবান। স্ত্রীর হাতখানা তুলে নিয়ে বললে, তোমার জন্য ভারী দুঃখ হচ্ছে আমার। কোথায় হতে বসেছিলে ভেলপুরার রাজরানী, তার বদলে হয়ে গেলে ভাঙা বাড়ির বৌ!

নববধূ গুছিয়ে জবাব দিতে পারল না। মুখ নীচু করে শুধু বললে, ধ্যেৎ!

: 'ধ্যেৎ' কি গো! আমি তব্‌লা বাজাতেও জানি না। তাছাড়া কাশীতে বিয়ে হলে আজ রাতেই কোলজোড়া সন্তান পেতে—এখানে তোমাকে—

ছোট্ট মুঠি দিয়ে বরের মুখ চেপে দিয়েছিল বালিকা বধূ। মুখ ঘুরিয়ে বললে, অমন করলে কথাই কইব না আমি।

সত্যবান ওকে টেনে নেয় কাছে। বলে, বেশ, ওসব কথা বলব না। এস, অন্য গল্প করি। তুমি কী কী বই পড়েছ? মানে বাংলা গল্পের বই? লেখাপড়ায়···

বাধা দিয়ে নববধূ বললে, আমি আঁক কষতে জানি না।

: আঁক কষতে জান না! আঁক কষার কথা কখন উঠল? কে তোমাকে বলেছে, এ বাড়িতে তোমাকে আঁক কষতে হবে শুধু?

: কাকামণি।

: কাকামণি? স্যার? স্যার বলেছেন আমি তোমাকে দিয়ে অঙ্ক কষাব?—হো হো করে হেসে উঠেছিল সত্যবান। বলেছিল, উনি ঠাট্টা করেছেন। না না, এখানে তোমাকে আঁক কষতে কেউ বলবে না ননী—

: আমার নাম 'ননী' নয়।

: ননী নয়? তবে কী নাম তোমার?

: কেন? তুমি জান না?

: না। তবে কী নাম তোমার?

: সাবিত্রী।

সত্যবান দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিল তার বালিকা বধূকে। মুখ-চুম্বন করেছিল। ওর বাহুবন্ধে প্রথম চুম্বনের আবেশে থর থর করে কেঁপে উঠেছিল বালিকা বধূ।

আশ্চর্য! এমন অপূর্ব মিলনান্তক নাটকের নায়িকা সাবিত্রী কিন্তু সুখী হতে পারেনি জীবনে। জ্বলেছেন সারাটা জীবন ঐ সত্যবানকে নিয়ে। কেন? দোষ কার? তোমরা বলবে সাবিত্রীর। সাবিত্রীও তাই বলতেন, যদি তোমাকে ঘর করতে হত অমন একটি অসামাজিক অবাস্তব অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে। আর তুমি ওঁর কাছে এসে কাঁদুনি গাইতে, বলুন তো দিদি, এমন মানুষের সঙ্গে ঘর করা যায়? তখন সাবিত্রীও ঠিক অমন করে উপদেশ দিতেন। বলতেন, ছিঃ! ও কথা বলতে নেই ভাই! তোমার ঘরের মানুষটা যে শাপভ্রষ্ট দেবতা। এমন মানুষকে হেনস্তা করছ? অমন দেবতুল্য মানুষকে নিয়ে যদি ঘর করতে না পার তবে তোমার গলায় দড়ি। গলায় দড়ি!

না, হেনস্তা করেননি কোনদিন। জানতেন, মানতেন, সত্যবান ছিলেন শাপভ্রষ্ট দেবতা। সত্যাশ্রয়ী, আদর্শবাদী। সেজন্য কি গর্ব ছিল না তাঁর? ছিল। বুনো রামনাথের শাঁখা-সর্বস্ব সীমন্তিনীর মত তিনিও গহনা-গর্বিতা প্রতিবেশিনীদের বলতে পারতেন, এই শাঁখা যতদিন আছে নবদ্বীপের মানও ততদিন আছে। বলতে পারতেন কেন, বলেছিলেনও একদিন। স্নেহবালাকে কি একদিন তিনি বলেননি, নিজের জন্য সাজিনি দিদি, উনিও অতবড় হাতীটাকে নিজের মর্যাদা-বৃদ্ধির জন্য হাজির করেননি। বলেছিলেন বলে যে তৃপ্তি পেয়েছিলেন, তেমন তৃপ্তি জীবনে পাননি। সমস্ত জীবনব্যাপীই তো অমাবস্যার মেঘমেদুর নীরন্ধ্র অন্ধকার—ঐ একটিবার মাত্রই ঝিলিক দিয়েছিল বিদ্যুৎ।

উনি, মানে সত্যবান প্যারাবোলা তখন কিষেনগড়ে যমুনাবাঈ বয়েজ স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার। সেটা বোধহয় ওঁর তৃতীয় চাকরি। না কি চতুর্থ? মোট কথা বারে বারে ঝগড়া বিবাদ করে চাকরি ছাড়তে ছাড়তে এসে পৌঁচেছেন বিহারের এই নগণ্য গণ্ডগ্রামে। কিষেনগড়ের বাবুসাহেব ওঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের গ্রামে। মায়ের নামে স্কুল খুলেছেন বাবুসাহেব, নিজে লেখাপড়া জানতেন না। বিরাট জমিদারী, প্রচুর খাতির। গড়ের মত প্রকাণ্ড রাজ-প্রাসাদ ছাড়াও মতিগঞ্জে ছিল বাগানবাড়ি ; ঘোড়াশালে ওয়েলার ঘোড়া ছাড়াও ছিল হাতিশালে হাতী। সন্ধ্যায় রামাওতার পেস্তা-বাদাম-ঘোঁটা সিদ্ধাই সববরাহ করত, তবু ভূগর্ভস্থ সেলারে ছিল খানদানি বিলাইতি। অন্দরে সুন্দরী স্ত্রী সত্ত্বেও মতিগঞ্জের বাগান-বাড়িতে ছিল পোষা ময়না। বাবুসাহেব অশ্বপৃষ্ঠে যখন পথ দিয়ে যেতেন, সড়কের মানুষজন পথ ছেড়ে দিত, ঝুঁকে সেলাম জানাতো। তবু শান্তি ছিল না বাবুসাহেবের। একটা হীনমন্যতায় ভুগতেন। তিনি মূর্খ। সাহেবসুবোর সঙ্গে আংরেজিতে বাৎচিৎ করতে পারতেন না। লাখ টাকার দলিলে যখন আঁকাবাঁকা হরফে সই দিতে কলম ভোঁতা করে ফেলতেন, তখন দেখতে পেতেন—সাবরেজিস্ট্রি অফিসের কেরানী-বাবু মুখ লুকিয়ে হাসছে। তাই মায়ের নামে গাঁয়ে স্কুল খুলেছিলেন।

তখন আর্য হয়েছে। স্কুলে ভর্তি হয়েছে। নিউটন আর অতসী আসেনি ওঁর সংসারে। জায়গাটা নিতান্ত গণ্ডগ্রাম। বাঙালী বলতে তিনি একাই। স্কুলের শিক্ষককুলে আর সবাই বিহারী। বাবুসাহেবের একমাত্র পুত্র রাম—রামসুভগ সিং, তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে। ঐ যাকে তোমরা আজকাল বল ক্লাস নাইন। অর্থাৎ পরের বছর ম্যাট্রিক দেবে। ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা। সত্যবান তাকে বাড়িতে পড়ান, সন্ধ্যার পরে।

বছর দুই ওঁরা কিষেনগঞ্জে থাকার পর খবর পাওয়া গেল, নিবারণ মজুমদার সাহেব বদলি হয়ে এসেছেন মতিগঞ্জে। মতিগঞ্জ

সদর শহর—মাইল ছয়েক দূরে। বাবুসাহেব প্রতি শনিবার ঘোড়ায় চেপে মতিগঞ্জে যেতেন, ফিরতেন সোমবার সন্ধ্যায়। বাঁধা ব্যবস্থা ছিল বাগানবাড়িতে। নিবারণ মতিগঞ্জে বদলি হয়ে আসার পরেই স্নেহবালা খবরটা পত্রযোগে জানালেন ছোট বোনকে। লিখলেন, চলে আয় কদিনের জন্য খোকাকে নিয়ে। কী পড়ে আছিস জঙ্গলের মধ্যে ? তোর ঐ প্যারাবোলা-স্যারকে কদিন হাত পুড়িয়ে রাঁধতে দে। তাহলেই তোর কদরটা বুঝবে।

চিঠিখানা পড়ে স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে সত্যবান বলেছিলেন, ভাল কথাই তো লিখেছেন দিদি। যাও, দুদিন ঘুরে এস মতিগঞ্জ থেকে।

: না। থাক।

: কেন ? থাকবে কেন ? নিজের দিদি তোমার—আদর করে ডেকেছেন—তাছাড়া সত্যই তো একটানা এ গ্রামে পড়ে আছ ; দুদিন বায়োস্কোপ-টায়োস্কোপ দেখতে পারবে।

: বায়োস্কোপ দেখতে যাবার মত একখানা শাড়িই কি আছে ছাই !

ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন সত্যবান।

তবু সাবিত্রীর আপত্তি টেকেনি। এক শনিবারে গাড়ি হাঁকিয়ে সপরিবারে দারোগা সাহেব এসে উপস্থিত। স্নেহবালা, নিবারণ, অস্ত-নস্ত। মাননীয় কুটুম্বকে কোথায় বসাবেন, কী খেতে দেবেন, কী-ভাবে আপ্যায়ন করবেন ভেবেই পান না। শনি-রবি দুটো দিন ছিলেন ওঁরা—সাবিত্রীর ঐ দু-কামরার খাপরার বাড়িতে রীতিমত গুঁতোগুঁতি করে। বিছানা ওঁরা সঙ্গে করেই এনেছিলেন। মায় টিন-বন্দী খাবারও। নিবারণ কৌতুক করে বলেছিলেন, ভায়া, রাগ কোরো না, অভ্যাসের দাস আমি। কফি না হলে আমার দাস্ত সাফা হয় না।

কফির কৌটা, ছেলেদের বোর্নভিটা, অথবা স্নেহবালার জর্দার ডিব্বাটাকে না হয় মেনে নেওয়া যায়, বিস্কিটের টিন পাঁউরুটিও না হয় সহ্য করা যায়—কিন্তু তাই বলে কনডেনসড্ মিল্ক, টিনড্-মাছ!

গাঁ-ঘরে কি দুধ-মাছও দুষ্প্রাপ্য? ব্যবহার কিন্তু অমায়িক। শুধু নিবারণ-স্নেহবালাই নন, অন্ত-নস্তরাও। যেন ওরা পিকনিকে এসেছে। সব কিছুতেই অন্ত-নস্তর বিস্ময়। কুয়ো থেকে জল তোলায় ওদের উৎসাহ, গাছে চড়ায়, পুকুরে ঝাঁপাই ঝোড়ায়।

স্নেহবালাও খুশিয়াল। শুধু খুঁতখুতুনি ঐ খাটা পায়খানাটায়। বলেন, প্যারবোলাভাই, বাবুসাহেবকে বলে পায়খানাটা পাকা করে নাও।

সত্যবান বলেছিলেন, আপনি যদি মাঝে মাঝে পদধূলি দিতে স্বীকৃত হন, তাহলে না হয় নিজেব খরচেই ওটা করে নেব!

: বা রে! এবার তো তোমরা রিটার্ন ভিজিট দেবে।

সত্যবান হেসেছিলেন। জবাব দেননি।

: কী? জবাব দিলে না যে বড়? কথা দাও, ছোটখুকিকে নিয়ে পরের সপ্তাহে আসবে?

: না দিদি। এখন আমার যাওয়া হবে না। সামনেই ছেলেদের পরীক্ষা—

: পরীক্ষা তো ছেলেদের। তোমার কী? শনি-রবি তো স্কুল বন্ধ?

: না। ওরা যে বাড়িতে পড়তে আসে।

নিবারণ এবার উৎসাহিত হন: ভেরি গুড! প্রাইভেট টিউশানি ধরেছ তাহলে? দুটো পয়সা আসছে—

আবার নিরুত্তর হয়ে পড়েন সত্যবান। এবার সাবিত্রী বলেন, উনি প্রাইভেট টিউশানি কবেন না। যারা বাড়িতে পড়তে আসে তারা বাড়তি মাইনে দেয় না।

আকাশ থেকে পড়েন নিবারণ দারোগা: সে আবার কি? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছ? তোমার কপালে দুঃখ আছে ভায়া!

নিবারণ এতদিনে পুরোপুরি আবগারি দারোগা। উপার্জনে সব্যসাচী। তাই এই সামান্য মাহিনাতেই গাড়ি কিনতে পেরেছেন। সোমবার সপরিবারে ফিরে গেলেন তিনি মতিগঞ্জে।

সাবিত্রী দোটানায় পড়ে গেলেন। সত্যবান যাবেন না, এটা

জানা কথা। তাঁর নিজেরও ইচ্ছা নেই। মানে, ইচ্ছা আছেই—তখন কতই বা বয়স সাবিত্রীর! বাইশ-তেইশ। ঐ বয়সে সেজে-গুজে সিনেমা যেতে, শহর-গঞ্জে ঘুরে বেড়াতে কোন্ মেয়ে না চায়? কিন্তু সঙ্কোচও আছে। দারিদ্র্যের অভিমান। অথচ ওদিকে আজুর তাগাদার বিরাম নেই। ইতিমধ্যেই সে অক্ত-নক্তর সাকরেদ হয়ে পড়েছে। যাই কি না-যাই করতে করতেই দারোগা সাহেব দ্বিতীয়বার গাঁয়ে পিকনিক করতে এলেন। এর পর একবার না যাওয়া ভাল দেখায় না। সত্যবান ব্যবস্থা করে দিলেন। সুন্দরলাল চেনা লোক। বাবুসাহেবের প্রজা, এ গাঁয়েই বাড়ি। তারই টাপর-তোলা গো-গাড়িতে বসিয়ে দিলেন সাবিত্রী আর আজুকে। কাঁচা সড়কে একেবারে আক্ষরিক অর্থে নাচতে নাচতে সাবিত্রী দিদির বাসায় রওনা দিলেন।

কিন্তু ফিরে যখন এলেন তখন তাঁর মুখ গম্ভীর। ঠিক কী যে ঘটেছিল, কোথায় আঘাত লেগেছিল অভিমানিনী মেয়েটির, তা সাহস করে জানতে চাইলেন না সত্যবান। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এ রোগের কোন ওষুধ নেই। 'মাথায় হল সর্পাঘাত কোথায় বাঁধবি তাগা!' দারিদ্র্য ঐ মস্তকে-সর্পাঘাত! তেলে-জলে মিশ খায় না, হোক না মায়ের পেটের বোন।

এ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হয়নি, কিন্তু বুঝলেন দুজনেই। তাই বা কেন? বুঝলেন চারজনেই। বেশ বোঝা গেল—মাখামাখিটা ও-পক্ষও আর চাইছেন না। সেই কালো রঙের মরিস্ গাড়িটা কাদা-জল ভেঙে আর এল না কিষেনগড়ে। প্রবাসে বাঙালী, তায় মায়ের পেটের বোন—তাহলে কি হয়? তেল আর জল! ও মিশ খায় না। সব্যসাচী নিবারণ দারোগা দুহাতে উপার্জন করছেন, খরচ করছেন—তাঁর মান আছে, মর্যাদা আছে, সম্ভ্রম আছে। শহরগঞ্জের প্রতিবেশিনীর মান রেখে ঐ শাঁখাসর্বস্ব মেয়েটি যে কিছুতেই ড্রেস করে শাড়ি পরবে না, দু-দিনের জন্যও দিদির গহনা গায়ে দেবে না,—

তার পরিচয় দিতেই স্নেহবালার মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত হল যেদিন এস. ডি. ও-র স্ত্রী মিসেস্ মেহ্‌রা ওকে বাড়ির ঝি বলে ভুল করলেন। সাবিত্রী দরজা খুলে দিতেই মিসেস্ মেহ্‌রা বলেছিলেন, তুমহারা মাঈজীকো কহো কি মিসেস্ মেহ্‌রা আয়ী হ্যাঁয়!

অতিথিকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে ফ্যানটা খুলে দিয়ে অন্দরে এসেছিলেন সাবিত্রী। দিদিকে ডেকে দিয়ে বলেছিলেন, লক্ষ্মীটি, ওঁকে আমার পরিচয়টা দিস্‌নে, ভীষণ লজ্জা পাবেন ভদ্রমহিলা।

মিসেস্ মেহ্‌রা যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ অন্দরে মুখ লুকিয় বসে রইলেন সাবিত্রী।

দু পক্ষই বুঝলেন। এসব কথা খোলাখুলি আলোচনা করা যায় না। আকারে-ইঙ্গিতে বুঝে নিতে হয়। তাই মাত্র ছ মাইল ব্যবধানে দুটি প্রবাসী বাঙালী মহিলা—দুই সহোদরা-- যেন ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা হয়েই কাটিয়ে দিলেন দুটি বছর।

তবু সামাজিকতার দায় বড় দায়। তাই আবার একদিন জলকাদা-ভেঙে মরিস্ গাড়িটাকে আসতে হল কিষেণগড়ে। আমকাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা মাস্টারের খাপরার ঘরে। সত্যবানের হাত দুটি ধরে স্নেহবালা বললেন, প্যারাবোলাভাই, কখনও কোন অনুরোধ করিনি। আজ বাড়ি বয়ে করতে এসেছি। তোমাকে যেতেই হবে। এই আমার প্রথম কাজ। তোমরা যদি না গিয়ে দাঁড়াও তাহলে আমার মাথা হেঁট হবে।

সেটাই বড় কথা। ভাবলেন সত্যবান। আপন বোন, আপন ভগ্নিপতি, নিজের বোনপো উৎসব-বাড়িতে অনুপস্থিত থাকলে স্নেহবালার আনন্দের জোয়ারে ভাঁটার টান পড়বে না। কিন্তু মতিগঞ্জের সবাই যে জেনে ফেলেছে—ওঁর বোন-বোনাই থাকে মাত্র তিন ক্রোশ দূরে। তাই এদের অনুপস্থিতিতে সমাজে অপ্রস্তুত হবেন ওঁরা, মাথা হেঁট হবে। সবাইকে কৈফিয়ত দিতে হবে—এত কাছে থাকেন ওঁরা, এলেন না কেন?

সত্যবান বললেন, যাবে বইকি দিদি। অন্তর উপনয়ন, আমাকে তো যেতেই হবে।

: শুধু তাই নয়, তোমাকে আচার্য হতে হবে।

: ঐটা মাপ করবেন ; এই দেখুন—

ফতুয়া তুলে দেখালেন তাঁর গলায় পৈতে নেই। পৈতে পুড়িয়ে ভগবান হননি সত্যবান প্যারাবোলা, তবে ভড়ংও করতেন না। সাফ কথা তাঁর—ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী করি না, দিনান্তে একবার ভগবানকে ডাকি না। পৈতে গলায় দেব কোন্ অধিকারে ? আমি কি বামুন ? আমি অঙ্কের মাস্টার।

বস্তুত ঈশ্বর তিনি মানেন, তবে প্রচলিত অর্থে নয়। এই বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্কশাস্ত্রবিদের অভিধাটাই মানেন : That deeply emotional conviction of the presence of a superior reasoning power which is revealed in the incomprehensible universe, forms my idea of God—অপরিজ্ঞেয় বিশ্বপ্রপঞ্চরহস্যের মর্মমূলে আছেন যে পরম যুক্তিবাদী অপরিসীম শক্তি, তিনিই ওঁর ঈশ্বর। অর্থাৎ সহজ ভাষায়—ইনফেনিটাম টু দ্য পাওয়ার ইনফেনিটাম ! কী আশ্চর্য ! বুঝলে না ? 'ইনফেনিটামের অর্ডার আছে জান তো ? ফাস্ট অর্ডার, সেকেণ্ড অর্ডার, থার্ড অর্ডার,...এই রকম এন-এথ্ অর্ডার অফ ইনফেনিটাম, যখন 'এন ইটসেল্‌ফ্ ইজ ইনফিনিটি!' যা ব্বাবা! এত সহজ কথাও বুঝলে না! তাহলে সোজা হিসাব বুঝে নাও : ঈশ্বর এমন একজন আদর্শ ম্যাথমেটিশিয়ান যাঁর অঁাকে কখনও ভুল হয় না। ব্যাস্। সরল ডেফিনিশান। শ্লোকার্ধে বুঝিয়ে দিলাম।

: কী বকছ বিড়বিড় করে ? কথার জবাব দাও ? আসবে তো, প্যারাবোলাভাই ?

: যাব দিদি। তবে এক শর্তে।

: শর্ত ! কী শর্ত—স্নেহবালা একটু শঙ্কিত। ওপাশে বসেছিলেন

নিবারণ : তিনিও উৎকর্ণ। এই সব পাগল-ছাগল মানুষের শর্ত বড় বিদঘুটে গোছের। তা না যায় পালন করা, না প্রত্যাখ্যান করা। ওঁদের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যখন সত্যবান বললেন, সেখানে সর্ব-সমক্ষে আপনি আমাকে 'প্যারাবোলাভাই' বলে ডাকবেন না।

অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন নিবারণ। স্নেহবালা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলেন, বেশ, কথা দিলাম। যে-কদিন ওখানে থাকবে, 'চক্কোত্তি-মশাই' বলে ডাকব।

: না। অতটা দূরত্ব সইবে না। 'সত্যবান' বলেই ডাকবেন।

: তাই সই! তাহলে আমারও একটা শর্ত আছে সত্যবান। বল রাখবে?

এবার সত্যবানই শঙ্কিত। ভয়ে ভয়ে বলেন, কী?

: তোমরা ঐ গো-গাড়ি করে যেতে পারবে না। কবে যাবে বল, আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

সত্যবানের অন্তরে হাসি-মস্করার বাষ্পটুকুও যে এই সস্নেহ অনুরোধের সাহারায় উপে গেল তা টের পাওয়া গেল না ওঁর মুখ দেখে। হাসি হাসি মুখেই বলেন, তা হয় না দিদি। সে সময় নিবারণ-দার কত কাজ। গাড়ি ছাড়া উনি এক পাও চলতে পারেন না। তবে ভয় নেই, গো-গাড়িটা আমরা আপনাদের বাঙলো পর্যন্ত নিয়ে যাব না। কেউ দেখতে পাবে না।

নিবারণ তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, ভায়া বড় বেরসিক। তোমার দিদি কি সেজন্য বলছেন? নামটা তোমরা পালটে রেখেছ তাই ভুলে যাও—আমার সুতনুকা শ্যালিকার 'ননী'র শরীর টিপে দেখার সৌভাগ্য যদিচ হয়নি—এ বিষয়ে তোমার দিদির শ্যেনদৃষ্টি—তবু বিশ্বাস করি, পূজ্যপাদ শ্বশুরমশাই বৃথাই ওর নাম 'ননীবালা' রাখেননি। সেই ননীর পুতুল গো-গাড়ির ধকল সইতে পারবে না বলেই তোমার দিদি স্নেহবালার ভূমিকায় নেমেছেন।

সাবিত্রী বলে, জামাইবাবু কি তাহলে আমাকে নিতে স্বয়ং

আসবেন?

: আলবৎ। আমি তো তোমার মালঞ্চের মালাকরই হতে চাই দেবী! মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ—টেম্পোরারি সারথীই না হয় হলাম।

: দিদিকেও নিয়ে আসবেন তো?

: খুব সম্ভব নয়। তখন বাড়িভরা লোকজন থাকবে। তবে তোমার দিদির ভয় নেই, গাড়িতে ভায়া পাহারায় থাকবে।

হাস্য পরিহাসের পরিবেশটা ফিরে এসেছে। তবু সত্যবান শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন না। বললেন, না, গাড়ি পাঠানোর দরকার নেই। ঠিক কবে যেতে পারবেন তা এখনই বলতে পারছেন না। তবে যাবেন, নিশ্চয় যাবেন। সপরিবারে।

মনে আছে সাবিত্রীর, সে রাত্রে ঝগড়া করেছিলেন দুজনে। না, ঝগড়া নয়, এক হাতে যেমন তালি বাজে না, এক মুখে তেমন ঝগড়া করা যায় না। গাল পাড়া যায়, ঝগড়া নয়। সত্যবান একটি কথারও জবাব দেননি। কীই বা জবাব দিতে পারতেন তিনি? কী কৈফিয়ত আছে তাঁর? অভিযোগ তো সত্যই। তিনি গরীব। দরিদ্র স্কুল-মাস্টার। কলকাতার বাড়িটার ভাড়া না পাওয়া গেলে এ মাহিনায় গ্রাসাচ্ছদনই দুর্বহ হয়ে উঠত। আবগারী দারোগার সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। আবার যে-সে দারোগা নয়, অ্যান্টিড্রেক্স্‌ট্রাস্‌ দারোগা। সব্যসাচী! দক্ষিণহস্তের চতুর্গুণ উপার্জন যিনি করে থাকেন বামহস্তের হেলনে!

পরে বহুবার এ জন্য অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন সাবিত্রী। কেন সেদিন অত অত কড়া কথায় বিঁধেছিলেন সেই নির্বিরোধী মানুষটাকে? লোকটার অপরাধ কী! সৎপথে থাকতে চায়, এই তো? কাকামণিকে কি তিনি দেখেননি? তিনিও তো ছিলেন সত্যাশ্রয়ী, সন্ন্যাসী মানুষ। লেখাপড়া আর অঙ্ক নিয়েই কাটিয়ে দিলেন জীবনটা। বিয়ে থা করলেন না। ঘর-সংসার করলেন না। উপার্জন

যা করেছেন—মাহিনা থেকে, পরীক্ষার খাতা দেখে—সবই ঢেলে দিয়েছেন বৌঠানের পায়ে। না হলে কালীপ্রসন্ন দু-দুটি মেয়েকে সুপাত্রে বিবাহ দিতে পারতেন না, তিনি তো সারাজীবনে কিছুই উপার্জন করেননি—পূজা-অর্চনা করে, গুরুভাইদের নিয়ে কাটিয়ে দিলেন জীবনটা। সাবিত্রী কি জানেন না—ঐ মানুষটা তাঁর জন্য কত বড় স্বার্থত্যাগ করেছে? মজুমদারমশাই যেমন ঘড়ি-ঘড়ি শাড়ি-গাড়ি-গহনা এনে খুশী করেন স্নেহবালাকে, ঐ মানুষটা তা করে না, করতে পারে না; কিন্তু ঐ মানুষটাই কি একদিন অঞ্জলিবদ্ধ প্রণয়োপহার দেয়নি তার প্রেমাস্পদাকে—প্রাণের চেয়ে যা বড়, মান, তার জীবনের স্বপ্ন? তার, তার বাবার, তার গুরুর? এই যে আজ মফঃস্বল-স্কুলের পিঞ্জরে গ্লানিকর জীবনের বেড়াজালে পাখা ঝটপট করে মরছে মহা-গরুড় এজন্য দায়ী কে? সত্যবান? না। সাবিত্রী যে মর্মে মর্মে জানেন, সে জন্য দায়ী তিনি নিজেই।

বেচারী সত্যবান। বিবাহের ঠিক পরেই পিতৃহীন হন। একেবারে হঠাৎ। সন্ন্যাস রোগে। তবু পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। ওঁর নিজের সন্দেহ থাকলেও ওঁর অধ্যাপক তারাপ্রসন্ন রায়ের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। প্রকাশ্যেই বলতেন, ফার্স্ট হবে কি না বলতে পারি না, তবে ফার্স্ট ক্লাস পাবেই।

একেই বলে ভাগ্যের বিড়ম্বনা। পরীক্ষা যখন শুরু হল সাবিত্রী তখন আসন্নপ্রসবা। প্রথম দিন পরীক্ষা দিয়ে এলেন খোশ মেজাজে। ফার্স্ট পেপার—'থিওরি অব ইকোয়েশান' আর এ্যালজেবরা। পুরো একশো নম্বরই নির্ভুল করেছেন। সেকেণ্ড পেপারে একশোর ভিতর পঁচাশি নির্ভুল। পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরে দেখলেন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন সাবিত্রী। প্রসবযন্ত্রণা! দাইয়ের ব্যবস্থা ছিলই। বাড়িতেই জন্মেছেন সত্যবান, তাঁর দুই দিদি। বাড়িতেই আঁতুরের ব্যবস্থা। কিন্তু দাই ভয় পেয়ে যাওয়ায় মৃণ্ময়ী পাড়ার ছেলেদের দিয়ে ডাক্তার ডেকেছেন। ছেলে পরীক্ষা দিয়ে ফিরল; মা প্রশ্ন করবার অবকাশ

পেলেন না: কেমন পরীক্ষা দিলে? যদিচ তাঁর মনে ছিল—ঐটাই ছিল স্বর্গগত কর্তার একমাত্র ইচ্ছা। নিজে অঙ্কে অনার্স পাননি, ছেলে যেন ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে সে অভাব সুদে-আসলে উশুল করে। ছেলেকে ফিরে আসতে দেখে মা বরং বলেন, কী হবে খোকা?

: কী আবার হবে? দেখি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করে। উনি কি বলেন।

হাসপাতালে স্থানান্তর করার পরামর্শই দিয়েছিলেন ডাক্তার-বাবু। স্বাভাবিক প্রসব নাও হতে পারে। অগত্যা ছুটতে হল হাসপাতালে। সারারাত বসে রইলেন বাইরের অপেক্ষাগারে। ওষুধের গন্ধ, ব্যস্ত ওয়ার্ড-বয়দের ছোটাছুটি, সাদা পোশাক পরা নার্সদের যাতায়াত। মাঝে মাঝে ট্রলিতে করে ওষুধপত্র যাচ্ছে কোথায়, স্ট্রেচারে নিয়ে যাচ্ছে রোগীকে। বেঞ্চির একান্তে বসে কেটে গেল একটা বিনিদ্র রাত্রি। বারোটা নাগাদ শেষ ট্রাম ফিরে গেল শ্যামবাজারের দিকে। কলকোলাহল কমে এল কলেজ স্ট্রীটে। ঘরমুখো মানুষগুলো ঘরে ফিরে গেছে। দু-একটা দ্রুতগামী ট্যাক্সি ছাড়া ঐ জনবহুল রাস্তাটা গোবি মরুভূমির মত নির্জন। একপায়ে-খাড়া গ্যাসের বাতি ছাড়া কেউ জেগে নেই। ফুটপাথে, গাড়ি-বারান্দার নিচে শুয়ে আসে সারি সারি মানুষ—মুটে, ঝাঁকাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ভাজিওয়ালা এবং ভিখারি। তারপর ধীরে ধীরে পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে এল। সবার আগে তা টের পেল কলকাতার কাক। মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণের বটগাছটায় কলকণ্ঠে ডেকে উঠল ওরা। ফার্স্ট ট্রাম ছুটে গেল নির্ভীক বজ্রগতিতে—পথ ফাঁকা। হোস্ পাইপে জল ছিটোতে শুরু করল ওড়িয়া মেহনতি, সাইকেলে ঘন্টি বাজাতে বাজাতে খবরের কাগজ কেরিয়ারে নিয়ে ছুটে গেল বিহারী হকার, প্রথম ট্যাক্সি নিয়ে বের হল পথে পাঞ্জাবী সর্দারজী। বাঙালীর বাচ্চা তখনও নিশ্চিন্তে মাতৃগর্ভে ঘুমোচ্ছে!

সকালে ডাক্তারবাবু বললেন, আপনি পরীক্ষা দিতে যান সত্যবান

বাবু। মনে হচ্ছে আজও সারাদিন এভাবে যাবে। ওষুধ দিয়েছি, কিন্তু 'পেন' হচ্ছে না। আজ সারাদিনে যদি না হয় তাহলে রাত্রে 'সিজারিয়ান' করা হবে।

বাড়ি আর যাওয়া হল না। ওখান থেকেই গেলেন পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষার 'হল' এক রশি দূরে—দ্বারভাঙা বিল্ডিং-এ। থার্ড এবং ফোর্থ পেপার পরীক্ষা দিলেন। ক্যাল্‌কুলাস, স্ট্যাটিক্স আর ডিনামিক্স। তখন মিলিয়ে দেখার মেজাজ ছিল না, পরে জেনেছিলেন, শতকরা আশি নম্বর পেয়েছিলেন সে দুটি পেপারে। পরীক্ষা দিয়ে ফিরে গেলেন হাসপাতালে। তখন ভিজিটিং আওয়ার্স। মা এসেছেন পাড়ার একটি ছেলেকে নিয়ে। মায়ের মুখটা শুকিয়ে গেছে। ভয়ে। পুত্রের পরীক্ষা, না পুত্রবধূর জীবনাশঙ্কা ?

সে রাত্রেও 'সিজারিয়ান' করা গেল না। কি জানি কী অসুবিধা হল। আবার কেটে গেল একটা বিনিদ্র রাত্রি। আবার সকাল হল। সাবিত্রীকে স্টেচারে করে ওঁর চোখের সামনে দিয়েই যখন অপারেশান থিয়েটারে নিয়ে গেল তখন বেলা দশটা। দ্বারভাঙা হলে তখন প্রশ্নপত্র বিলি হচ্ছে,—ফিফ্‌থ্‌ পেপার।

সত্যবান চক্রবর্তী তখন সেখান থেকে দুশো গজ দূরে। মেডিকেল কলেজের কোরিন্থিয়ান-কলামে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বসে আছেন ক্লান্ত মানুষটা।

ঈশ্বর করুণাময়। যদি আদৌ ঈশ্বর বলে কোনও ম্যাথ্‌মেটিশিয়ান থাকেন ! প্রসূতি আর সন্তানকে জীবিত ফিরে পেলেন। কিন্তু খবরটা যখন পেলেন তখন 'দ্বারভাঙা হলে' গার্ড হাঁকছে : স্টপ রাইটিং !

ধমক খেয়েছিলেন সেজন্য ডাক্তারবাবুর কাছে : ছি ছি ছি ! আপনি কেন এখানে বসে আছেন ? আপনার কী করণীয় ছিল এখানে ? যান, সিক্সথ পেপার পরীক্ষা দিয়ে আসুন !

সব কথাই জানতেন তিনি। পরিচিত ডাক্তার। সত্যবান বলেন, ওরা দুজন…?

: ভাল আছে। কোন ভয় নেই। ছেলেই হয়েছে আপনার। যান, এখনও বোধহয় 'হলে' ঢুকতে দেবে—

রুদ্ধশ্বাসে ছুটেছিলেন দ্বারভাঙা হলের দিকে। দিয়েছিলেন শেষ পেপার পরীক্ষা : হাইড্রলিক্স এবং অ্যাস্ট্রনমি।

সাবিত্রীকে যমের মুখ থেকে ফেরত পেয়েছিলেন সত্যবান। পেয়েছিলেন প্রথম পুত্রকে, আজু, আর্যভট্ট ! এবং পেয়েছিলেন বি. এস্-সি. ডিগ্রি। হ্যাঁ, অনার্স সহ। পাস কোর্সে নয়। সেকেণ্ড ক্লাস। একশো নম্বর পরীক্ষা না দিয়ে। পঞ্চম পত্রে শূন্য পেয়েছেন। না। ভুল বললাম। শূন্য জীবনে কখনও পান নি। ওঁর জমার খাতায় শূন্য নয়। ইংরাজী বর্ণমালার অষ্টাদশ বর্ণ নয়, একেবারে আদ্য অক্ষর—অনুপস্থিতিসূচক।

তারাপ্রসন্ন তিরস্কার করেছিলেন, ছি ছি ছি ! এ তুমি কী করলে সত্যবান !

জীবনে প্রথম তিরস্কার। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন গুরুর সামনে।

: শোন। যা হয়ে গেছে তার আর চারা নেই। তোমার নিজের মেরিটেই তুমি এম. এস্-সি.-তে ভর্তি হতে পার। আমি ডীনকে বলেছি, ভি. সি.-কে বলেছি। তোমার খাতা ওঁরা দেখেছেন। তোমার কেসও ওঁরা জানেন। স্পেশাল পারমিশানে তোমাকে ভর্তি করে নেওয়া হবে। আজই দরখাস্ত করে দাও।

সত্যবান বলেছিলেন, তা হয় না স্যার। আমার চেয়ে যারা বেশি নম্বর পেয়েছে, তারাও ইন-অর্ডার-অব-মেরিট সীট পাচ্ছে না। পিছনের দ্বার দিয়ে আমি ঢুকতে চাই না। লোকে বলবে, জামাই হিসাবে আপনি আমাকে 'ফেবার' করেছেন।

: বলবে না। কেউ বলবে না। তোমার কথাটা সিণ্ডিকেটে তোল-পাড় করেছে, সবাই জানে। ঐ দুর্ঘটনা না ঘটলে তুমি শুধু ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্টই হতে না, এ বছর হয়তো ঈশান-স্কলার হতে।

ম্লান হেসে বলেছিলেন, তাছাড়াও অসুবিধা আছে স্যার। বাবা নেই। এখন আমাকে উপার্জন করতে হবে।

অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল তারাপ্রসন্নের দুটি চোখ। ওর হাতটা টেনে নিয়ে বলেছিলেন, কিন্তু তুমি কি বুঝতে পার না, এজন্য পরোক্ষ-ভাবে আমি নিজেকেই দায়ী করছি? আমিই যে তোমার সর্বনাশ করেছি!

গুরুর পায়ের ধুলো নিয়ে সত্যবান বলেছিলেন, অমন কথা বলবেন না স্যার! আশীর্বাদ করুন, যেন মানুষ হতে পারি।···

এসব কথা কি জানা ছিল না সাবিত্রীর? তাহলে সেদিন, সেই যেদিন স্নেহবালা আব নিবারণচন্দ্র অন্তুব উপনয়নে নিমন্ত্রণ করে গেলেন, সেদিন তিনি এত কঠোব হয়ে উঠলেন কেমন করে? লোকটার গায়ে যেন গণ্ডারের চামড়া! এত গালমন্দেও টুঁ শব্দটি করল না।

না, আবার ভুল হল। লোকটার গায়ে গণ্ডারেব চামড়া ছিল না। যন্ত্রণাবোধ তারও ছিল, যদিও মুখেব একটি পেশীও বিকৃত হত না। সত্যবান 'বুনো রামনাথ' নন! দাবিদ্র্যের একটা অন্তর্গূঢ় অভিমান যে তাঁব অন্তবে নিরন্তর তুষেব আগুন জ্বালিয়ে বেখেছিল তাব হস্তিবৃহৎ প্রমাণ তো সেবারই দিয়েছিলেন তিনি।

কেন যে সাবিত্রী সে-রাত্রে হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছিলেন তা প্রথমটায় বুঝতে পাবেননি, অঙ্কটা সল্‌ভ্‌ড হয়ে গেল যখন সাবিত্রী সুটকেসটা এনে দেখালেন। ডালা খুলে মেলে ধরলেন স্বামীর চোখের উপর। একটা একটা কবে টেনে টেনে বার করে ছুঁড়ে ফেললেন বিছানার উপর: মুর্শিদাবাদী, কাঞ্জিভরম, শান্তিপুবী, ঢাকাই!

স্নেহবালা সেটা গোপনে রেখে গিয়েছিলেন। ছোট বোনের হাত দুটি ধরে বলেছিলেন, তুই আমার মায়েব পেটের বোন। কিছু মনে করিস না ছুটকি, এটা রাখ্। আমার মাথা হেঁট হয় এ তুই নিশ্চয় চাইবি না। কাজের বাড়িতে যখন যাবি তখন এই সুটকেসটা নিয়ে যাস্। কাউকে কিছু বলিস না। ঐ পাগলটাকেও বলবি না। বুঝলি?

এর দিন-সাতেক পরে। বস্তুত উপনয়নের দিন সকালে। এ কদিন কর্তা-গিন্নিতে কথা বন্ধ। রাগে দুঃখে অভিমানে সাবিত্রী একেবারে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। ও যদি তর্ক করত, বলত, কী করব বল, যেতে চাও যাও, না যেতে চাও যেও না; আমি গরীব মানুষ ওঁদের সঙ্গে পাল্লা দেব কেমন করে?—তাহলেও একটা সান্ত্বনা থাকত। হয়তো সাবিত্রী বলতেন, তাতে কি? আমরা যা, আমরা তাই। কিন্তু লোকটা তাও বলল না। না রাম, না গঙ্গা। স্থির করেছিলেন, যাবেন না। উপনয়নের দিন ভোরবেলা সত্যবান কোথায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এলেন একটা প্যাকেট হাতে। সাবিত্রী তখন কাঠের উনানে ফুঁ পাড়তে ব্যস্ত। সকালবেলা বাসি পেটে এক কাপ চা খাওয়ার অভ্যাস তখনই হয়েছে। তাছাড়া রান্নাবান্না তো করতেই হবে, যাওয়া যখন হচ্ছে না।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সত্যবান বলেন, এ কি? রান্নার যোগাড় করছ যে? মতিগঞ্জে যাবে না?

উঠোনের ও-প্রান্তে পোষা ময়নাকে ছাতু খাওয়াচ্ছিল আজু। চকিতে সে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

সাবিত্রী ঘুরে বসলেন। কথা বলতেই হল: যাবে, তা তো বলনি?

: যাব না, তাই বা কখন বললাম? দিদিকে তো তুমি আমি দুজনেই কথা দিয়েছিলাম। নাও, তৈরী হয়ে নাও। এখনই যাব!

ভ্রূকুঞ্চিত করে সাবিত্রী বলেন, তোমার হাতে ওটা কি?

একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসে পড়েছেন ততক্ষণে। বলেন, ত্রিপাঠীজী কাল মতিগঞ্জে গিয়েছিলেন। তাঁকে দিয়েই আনিয়েছি। দেখ তো, খোকার গায়ে হয় কি না?

খোকা ততক্ষণে গুটিগুটি এসে দাঁড়িয়েছে বাপের পাঁজর ঘেঁষে।

এর পর আর রাগ করে থাকা চলে না। কারণ সত্যবান যে খোলা মোড়কটা ওঁর নাকছাবির সামনে মেলে ধরেছেন, তাতে খোকার

সাটিনের জামা ছাড়াও ছিল একটা বেনারসী।

: এ কী! এ যে বেনারসী! এর যে অনেক টাকা দাম!

সত্যবান কথা ঘুরিয়ে নেন: আংটিটা অন্তব হাতে ঠিক হবে, নয়?

বিস্ময়, বিস্ময়, তার উপর বিস্ময়! সংসার-অনভিজ্ঞ প্যারাবোলা-স্যার একেবারে নিখুঁত অঙ্কের হিসাব মিলিয়েছেন—শুধু সন্তান নয়, ধর্মপত্নীর শাড়ি, মায় শ্যালিকাপুত্রের স্বর্ণাঙ্গুরীয়!

: এত খরচ করতে গেলে কেন? কোথায় পেলে এত টাকা?

: কোনদিন তো তোমাকে কিছুই দিতে পারিনি সাবি, আজ আর এ নিয়ে রাগারাগি ক'র না।

চোখ ফেটে জল এসে যায়: হ্যাঁ গো, আমি কি শুধুই রাগারাগি করি?

: অ্যাই গ্যাখো! বে-ফাঁস একটা কথা মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে বলেই অমনি রাগ করছ?

হেসে ফেলেছিলেন এবার। এমন মানুষের উপর রাগ করে থাকা যায়?

কিন্তু চরম বিস্ময়টা তখনও বাকি ছিল। সেটা প্যাকেটে বেঁধে আনেননি সত্যবান। সেটা ছিল দুয়ারে বাঁধা! ঘরদোর বন্ধ করে, পিঠের উপর চাবির গোছা ফেলে আজুর হাত ধরে বাইরে এসেই আঁৎকে ওঠেন: ও মা গো! ওটা কী?

কেরামৎ মিঞা আভূমি নত হয়ে সেলাম করে বলেছিল, কুচ্ছু ডর নেহি আছে মাঈজী। কুন্তীমায়ী আপনাকে কুছু বলবে না। আসেন—এই রশিঠো পাকড়ে উঠে পড়েন।

প্রকাণ্ড হস্তিনী ততক্ষণে মাহুতের আদেশে বসে পড়েছে সামনের পা দুটি মুড়ে। সাবিত্রীর বিস্ময়ের ঘোরটা তখনও কাটেনি। স্বামীর দিকে অবাক-চোখ মেলে বলেন, এ কী গো?

হাসলেন প্যারাবোলা-স্যার: ভারতবর্ষের মেয়ে হয়ে এ জন্তুটা চেন

না ? এলিফ্যাস্ ম্যাক্সিমাস্ ! হাতী !

: হাতী তো বুঝলাম, কিন্তু···

: ওঠ। বলছি—

আজু তো আহ্লাদে আটখানা। দূর থেকেই দেখেছে দু-একবার। আজ তার পিঠে ! মখমলের গদি ! রীতিমতো হাওদা ! রোদ যাতে না লাগে তাই উপরে চাদোয়া ! শুধু তাই নয়, বাবু-সাহেবের হস্তিনী কুন্তীমায়ী আজ সালঙ্কারা। প্রসারিত শুণ্ডে বিচিত্র বর্ণের আলিম্পন, কানের আংটায় ঝুলছে রৌপ্যমণ্ডিত চামর, গলায় সারি সারি পিতলের ঘণ্টা—ঠুন ঠুন, গজেন্দ্রগমনের তাল রাখছে। গজকুম্ভে মখমলের ঝালর, তাতে ঝুটো-মুক্তোর মালা। যেন জয়পুরের মহারাজাকে নিয়ে দিল্লীর দরবারে চলেছে আজ কুন্তীমাঈ। না হবে কেন ? প্যারাবোলা-স্যার এমনই ফরমান জারী করেছিলেন যে : সুসজ্জিত রাজহস্তী চাই তাঁর !

যেতে যেতে রহস্যটা পরিষ্কার করেন। বাবু-সাহেবের ছেলে রামু, অঙ্কে বরাবর ফেল করত। প্যারাবোলা-স্যার তাকে সকাল-সন্ধ্যা প্রাইভেটে তালিম দিয়ে দু বছরে এমন পোক্ত করে দিলেন যে, ছোকরা অঙ্কে বেমক্কা লেটার পেয়ে গেল ম্যাট্রিকে। বাবু-সাহেব ওঁকে ধরে পড়েছিলেন, মাস্টার সাব, দু বরিষ আপনি বিনা-মাহিনায় ওক্‌রাকে পঢ়িয়েসেন। অব ইয়ে আনন্দ্‌কা রোজ থোড়াবহুৎ গুরু-দখ্‌ষিণা লেনেই পড়েগি ! কহিয়ে মাস্টার সাব, রামু আপনাকে কী পরনামী দিবে। আপনার হিঞ্ছা বাতাইয়ে।

অস্বীকার করেছিলন প্যারাবোলা-স্যার। এ আজ ছয় মাস আগের কথা। মর্মাহত হয়েছিলেন বাবু-সাহেব। কিন্তু অসীম প্রভাবশালী ব্যক্তিটি জানতেন, মাস্টার সাব আজীব-চিড়িয়া। হিঞ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে ইনাম দেওয়া যায় না, এতদিন পরে আজ কী খেয়াল হল, মাস্টারসাব সাক্ষাৎ করলেন বাবু-সাহেবের সঙ্গে। দাবী করলেন, তাঁর গুরু-দক্ষিণা। না, টাকাকড়ি ধন-দৌলত নয়—একদিনের জন্য রাজহস্তি-

টিকে ধার চান। সুসজ্জিত রাজহস্তি। ব্রাহ্মণীকে নিয়ে তিনি নেওতা রাখতে যাবেন। বাবু-সাহেব তো কৃতকৃতার্থ!

সেই দিনটাই সাবিত্রীর দাম্পত্যজীবনে নিববচ্ছিন্ন বঞ্চনার ইতিহাসে একটি মাত্র সাফল্যের স্বাক্ষর। নীবন্ধ্র অন্ধকাবে বিদ্যুতের ঝলক। ভগ্নীপতিকে বহস্য কবে বলেছিলেন, ভায়বা-ভায়ের কানে কী যে মন্ত্র দিয়ে এলেন মজুমদাব মশাই, ওঁব ধাবণা হল গো-গাড়িতে আমাব ননাব শবীব বুঝি সত্যিই গলে যাবে।

নিবাবণচন্দ্রেব বিস্ময়েব ঘোব তখনও কাটেনি। হাতীটা নিশ্চয়ই সত্যবানেব নয়, কিন্তু এমন দববাবী হস্তিনী সে পেল কোথায় ঐ অজ পাড়াগাঁয়ে। ইতস্তত কবে সে কথাটাই বলে বসেন, না,…মানে, ইয়ে…হাতিটা কাব?

সাবিত্রী জবাব দেবাব আগেই অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন সত্যবান: এটা তোমাব কেমন কৌতূহল নিবাবণদা! আমি তো জানতে চাইনি মবিস্ গাড়িটা কাব?

যতটা অবাক হলেন নিবাবণ তাব চেয়েও বেশী সাবিত্রী। নীবস-নিষ্কষ অঙ্কেব মাস্টাব যে এমন বহস্য কবতে পাবেন তা যেন ভুলেই গেছিলেন। তাহলে কি লোকটা নীবস নয়? মনে পড়ে গেল ফুলশয্যা রাত্রেব কথা—তখন তো লোকটা কৌতুক কবত, বহস্য কবত, হাসত! তাহলে কি সাবিত্রীই বদলে ফেলেছেন মানুষটাকে! মনে হল, কা বিচিত্র এই দুনিয়া—একটু আঘাত, একটু সরে-নড়ে বসা অমনি অতি-চেনা অতসী-কাচে ঝিলিক দিয়ে ওঠে নতুন বঙের বিচ্ছুরণ। প্রেম শুধু অচেনা মানুষকে আপনজন করেই ক্ষান্ত হয় না, চেনা মানুষের অচেনারূপও চিনিয়ে দেয়।

বাস্তবে ফিবে আসেন, নিবাবণের কথায়, না, না, মানে…তুমি হঠাৎ একটা হাতী কিনেছ…

সাবিত্রী বলেন, না না, কিনিনি। তবে গোরুর গাড়িতে চেপেও তো তোমার বাঙলোয় আসা চলে না, তাতে তোমাদের মাথা হেঁট

হয়। এ বরং ভালই হল, লোকে বলবে, দারোগা-সাহেবের কুটুম এসেছে হাতীতে চেপে।

নিবারণ গুম মেরে যান। স্নেহবালা একটি কথা বলেননি। তবু তৃপ্তি হয় না সাবিত্রীর; বলে, তোমাদের একটু অসুবিধাও হল অবশ্য। শহরগঞ্জ জায়গা, কলাগাছ, ডাল-পাতাই বা পাবে কোথা? আর তাতে তোমাদের মানও থাকবে না। কেবামৎকে জিজ্ঞাসা করে দেখ—ও কী খাবে?

: কেরামৎ কে। তখনও স্বাভাবিক হতে পারেননি নিবারণ-দারোগা।

: কেবামৎ মিঞা। কুম্ভীর মাহুত! না হোক আধ মণ চালের ভাত খাবে মনে হয়!

সাবিত্রী দিদিকে স্যুটকেসটা ফিরিয়ে দিল। আড়চোখে বোনের ঝলমলে বেনারসীটা দেখে স্নেহবালা আর কথা বাড়ালেন না। হাতীর রহস্যটা ওদিকে বেশ ঘনিয়ে উঠেছে। নিমন্ত্রিত যারা আসছে তারা আলোকসজ্জা দেখছে না, নহবৎ শুনছে না, দারোগাবাবুর দুয়ারে-বাঁধা সুসজ্জিত রাজহস্তিনীটাই হয়ে পড়েছে উৎসববাড়ির মূল আকর্ষণ।

রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল সান্ধ্য আসরে। ব্রাহ্মণভোজন ও আত্মীয়-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ ছিল দিনের বেলায়। সান্ধ্য পার্টিতে আমন্ত্রণ ছিল সাহেব-সুবোর। আবগারী দারোগার বাড়িতে উৎসব—হোক না কেন পুত্রের উপনয়ন—সেটা রসসিক্ত হওয়া চাই। আত্মীয়স্বজনেরা সেই বিহারের বাঙলোতে আর কেউ আসেননি, না এ-তরফের, না ও-তরফের। ফলে চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। বাড়ির পিছন দিকে সামিয়ানা খাটিয়ে কক্‌টেল-পার্টির আয়োজন হয়েছে। অন্তু তো দণ্ডীঘরে, নন্তু বা আজুর ওদিক পানে যাওয়া মানা। আজুর বাপকে কেউ বারণ করেনি, কিন্তু তিনি ও-দিগড়ে যাননি। শহরের সেরা দোকান থেকে এসেছে সেরা মাল। তক্‌মা-আঁটা খিদ্‌মদ্‌গার পানপাত্র হাতে মেহমানদের সামনে বারে বারে ঘুরেফিরে আসছে। ঐ সঙ্গে কাজুবাদাম, চিকেন-

লিভার, পাকৌড়া, শামি-কাবাব। শহরের কর্তাব্যক্তি কেউ আর বাকি নেই। মিউনিসিপ্যালিটি আর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, এস. ডি. ও. নর্থ, সার্কেল অফিসার, ট্রেজারি অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, কেরু কোম্পানির দুজন সাহেব-মেম—মায় এ. ডি. এম., ডি. এম.। বাড়ির সামনে খান আট-দশ সিডানবডি গাড়ি—ব্যুইক, শেভ্রলে, অস্টিন, ফোর্ড। তখনও জীপ বা ওয়েপন ক্যারিয়ারের আমদানি হয়নি ভারতবর্ষে। এমন সময়ে যেন শৈলেশর মন্দিরে প্রবেশ করলেন দুর্গেশ-নন্দিনীর নায়ক। তেজিয়ান ঘোড়ায় পিঠে। মাথায় পাগড়ি, পরনে ব্রিচেস, খাটো কুর্তা, মোম-দিয়ে-পাকানো গোঁফ, কিষণগড়ের বাবু-সাহেব। পানাসক্ত পঁচিশ জোড়া চোখ দেখল—একেবারে সামিয়ানার দ্বারদেশে এসে গতি সম্বরণ করলেন অশ্বারোহী। দেলাক্রোয়ের আঁকা নেপোলিয়ানের ঘোড়ার মত সামনের দু পায়ে আকাশ আঁচড়ে সংযত হল ওয়েলারাবতংশ। বাবু-সাহেব নামলেন। ও-পাশের অর্জুন গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধলেন ঘোড়াটাকে। ব্যাটনটা বগলদাবা করে হাতটা তালি বাজিয়ে ঝাড়লেন। তারপর বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এলেন প্যাণ্ডেলের দিকে। ঠিক প্রবেশমুহূর্তে নিজেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন দেলাক্রোয়ার ঘোড়ার মত।

কারণ ঠিক তখনই নৈশ-আকাশ বিদীর্ণ করে শোনা গেল এক বৃংহিতধ্বনি।

: হা-রে-রে! কুন্তীমায়ী! তুনে মুঝ্‌কো দেখ্‌ লি!

ফিরে যেতে হল বাবু-সাহেবকে। বাগানের ও-প্রান্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রকাণ্ড হস্তিনী তখন সামনে-পিছনে দুলছে। অশান্ত হয়ে উঠেছে। বাবু-সাহেব ওর গজকুম্ভে হাত বুলিয়ে আদর করে শান্ত করে ফিরে এলেন আবার। সমবেত সকলকে অভিবাদন করলেন।

: আইয়ে, আইয়ে বাবুসাব তস্‌লিম রাখিয়ে।

এ. ডি. এম. অরোরা রহস্য করে বলেন, বাবু-সাব, এ আপনার কেমন ব্যবহার?

: কেঁও সাব ? ক্যা কসুর হুয়া মুঝ্‌কো ?

: আমরা এক-একটা বাহন নিয়ে এসেছি সবাই—আপনি দুটো বাহনে চেপে একা এসেছেন ?

: নেহী জী ! ইয়ে ঘোড়া মেরা হ্যায়, লেকিন বহ্‌ হাঁথিকী মালিক ম্যয় নেহী হুঁ ।

: সে কি ! আমরা তো জানি ও হাতীটা আপনার ?—এবার সপ্রশ্ন এস. ডি. ও. নর্থ।

: জী নেহী সাব । উসকী মালিক হ্যাঁয় মাস্টার-সাব ।—নিবারণের দিকে ফিরে বলেন, আপ্‌কা ব্রাদার-ইন-ল ।

নিবারণ বিব্রত। সকলেই উৎসুক। সবাই কৌতূহলী। পানপাত্রটা হাতে নিয়ে গল্প ফাঁদলেন বাবু-সাহেব। শুরু করলেন আজীব-আদমী ঐ প্যারাবোলা-স্যারের উপাখ্যান। রহস্য করেই মজাদার ঢঙে বলতে থাকেন, যদিও সেই হাস্যরসের পরতে পরতে অনুভূত হল সেই ব্যতিক্রম-মানুষটার প্রতি বাবু-সাহেবের অন্তরের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এমন ইমানদার পণ্ডিতমূর্খ নাকি জিন্দিগিভর তিনি দেখেননি ! মূর্খ নয় ? মিছে কথা বলতে পারে না, বে-ফায়দা পরের উপকার করে, লোকে যেচে টাকা দিতে এলে ঘট-ঘট করে মাথা নেড়ে অস্বীকার করে ! উপসংহারে গৃহস্বামীকে রহস্য করে চোস্ত উর্দুতে যে-কথা বললেন তার নির্গলিতার্থ : যদিচ একই বাগিচায় ঢুকে একই গাছের, একই বৃন্তের দুটি কলিয়াঁ চয়ন করেছেন আপনারা, তবু মাফ করবেন দারোগা সাব—আপনি আর আপনার ভায়রাভাই দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা।

গৃহস্বামীর যথেষ্ট নেশা হয়েছিল। মালুম হল না বাবু-সাহেব এটা কী করলেন, খোশামোদ না খিস্তি। প্রশস্তিই যদি হবে তবে তাঁর কান দুটো এমন বেমক্কা লাল হয়ে উঠছে কেন ? ক' পেগ খেয়েছেন এ পর্যন্ত ?

মিসেস অরোরা কৌতূহল দেখিয়ে বলেন, কী আশ্চর্য ! আপনার ভায়রাভাই এ বাড়িতে উপস্থিত ? কই, আপনি তো আমাদের

তাঁর সঙ্গে ইনট্রোডিউস করে দিলেন না।

: কেমন করে দেবেন ?—তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন বাবু-সাহেব—তিনি যে বিপরীত মেরুর বাসিন্দা! ভায়রাভায়ের অ্যাকাউন্টে মদ্য-পানের এমন মওকা যদি নিতে পারবেন তাহলে তাঁকে পণ্ডিত-মূর্খ বলব কেন ? শুনলেন না, আমি সদ্-ব্রাহ্মণকে কয়েক বিঘে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দিতে চাইলাম, পছন্দ হল না তাঁর। পরিবর্তে হাতী চেপে দারোগা-সাহেবের বাড়ি নেওতা রাখতে এলেন!

নিবারণের মনে হল, এতে তাঁর অপমানিত বোধ করার কোন কারণ থাকতে পারে না, কিন্তু ঝোড়ো হাওয়ায় হঠাৎ ছাতা উল্টে গেলে যেমন অহেতুক অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে মানুষে, তেমনি বোধ হচ্ছিল তাঁর।

সম্মিলিত কৌতূহলই জয়ী হল। সকলেই চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে উৎসুক। এমন একটি আজব চিড়িয়া না দেখে কেউ থামবে না। বাধ্য হয়ে প্যারাবোলা-স্যারকে আসতে হল প্যাণ্ডেলে। গৃহস্বামী পরিচয় করিয়ে দিলেন. আমার ব্রাদার-ইন-ল, সত্যবান চক্রবর্তী।

সমবেত সাহেবসুবোদের পরিচয় দানের মত মন বা মেজাজ অবশিষ্ট ছিল না তাঁর।

গরদের পাঞ্জাবি-পরা মানুষটা তাঁর কদমছাঁট চুলেভরা মাথাটা নুইয়ে সমবেত নমস্কার করেন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব বলেন, সত্যবান চক্রবর্তী! বাই দ্যা ওয়ে, আপনি কি ক্যালকাটার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯২৮-এ বি. এস্-সি. পাস করেন ?

বক্তা কে তা জানতেন না সত্যবান, স্বীকার করলেন অপরাধটা।

: অঙ্কে অনার্স ছিল ? ফিফ্থ্ পেপারে অ্যাবসেণ্ট ছিলেন, নয় ?

সকলেই স্তম্ভিত। আই. সি. এস্. অফিসারটির স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ তা সবাই জানতেন, কিন্তু কে কোন পেপারে অনুপস্থিত ছিল তা কি এতদিন পরে মনে থাকে!

সত্যবান বলেন, হ্যাঁ। কিন্তু আপনি তা কেমন করে জানলেন ?

আমি তার পরের বছর পাস করি। আমারও অঙ্কে অনার্স

ছিল। আপনার বিচিত্র রেকর্ডের কথা তো সে আমলে সবাই জানত। বসুন, দাঁড়িয়ে কেন—?

'সেটির' বাকি অর্ধাংশ নির্দেশ করেন। সৌজন্যবোধে জেলা-সমাহর্তার বাকি অর্ধাসন এতক্ষণ খালিই রাখা ছিল। প্যারাবোলা-স্যার মূর্খ। অবশ্য উনি জানতেন না, বক্তা কে, তাঁর সঙ্গে একই আসনে বসা উচিত কি অনুচিত। দিব্যি বসে পড়লেন পাশে।

অতঃপর সমবেত কৌতূহল মেটাতে সেই বিচিত্র রেকর্ড-এর ইতিবৃত্ত শোনাতে হয়।

প্যারাবোলা-স্যার সলজ্জে বারে-বারে বাধা দিতে চান। তবু গল্পটা বলা হল।

বিদায় নেবার পূর্বে এস. ডি. ও-নর্থের স্ত্রী মিসেস্ মেহ্‌রা সাবিত্রীর হাতটা চেপে ধরেছিলেন। তাঁকে জনান্তিকে টেনে এনে বলেছিলেন, মুঝে মাফি কিয়া যায় বহিনজী, ম্যায় উস্ রোজ আপকি…

সাবিত্রী ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, সে দোষ আমারই। ও-কথা তুললে আপনিও লজ্জা পাবেন, আমিও লজ্জা পাব। অন্য কথা বলুন—

: অন্য কথা আর কী বল্‌ব? আজকের দিনে ঐ একটাই তো কথা। আপনি সত্যই সৌভাগ্যবতী। উৎসব-বাড়িতে সমাগত প্রতিটি বিবাহিত মহিলার কাছে আজ আপনি ঈর্ষার পাত্রী। তারা শাড়ি-গাড়ি-গহনাই পেয়েছে জীবনে, কিন্তু যা পেলে, নারী-জন্ম সার্থক হয়, তা পায়নি। খাঁটি মানুষের ঘরণী হওয়া যে একটা দুর্লভ সৌভাগ্য। ওরা সত্যবানের স্ত্রী সাবিত্রী হতে পারেননি কেউ!

লজ্জায় মাথাটা তুলতে পারেননি সাবিত্রী।
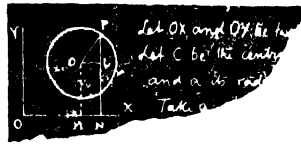
থ্রি-টায়ার কামরাটায় শুধু নাইট-লাইট জ্বলছে। নীলাভ আলোয় কামরাটা আবছা। নিচেকার বার্থে শুয়েছেন সাবিত্রী, পাশেই সুরমা। মাঝের বার্থ দুটিতে টনি আর নিতুন। তার উপরে দুজন অচেনা মানুষ। অজানা প্রান্তর ভেদ করে ছুটে চলেছে মেল-গাড়ি। কাশীর সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে, নিকটতর হচ্ছে অমৃত ব্যানার্জী রোডের চির-চেনা বাড়িটা। কিন্তু কদিন? এ বছর আর সে বাড়িতে নিজে হাতে কার্নিসে-কার্নিসে দীপাবলীর প্রদীপ সাজাবেন না সাবিত্রী। তার আগেই ফিরে যাবেন সেই মানুষটার কাছে—যে আজ অবস্থত, অবমানিত, উপেক্ষিত! আশ্চর্য! কেমন করে তাঁকে ভুলে ছিলেন এতদিন? না, ভুলে থাকেননি। বারে বারে তাঁর কথা মনে পড়েছে এ পাঁচ বছরে—নানা পরিবেশে, নানা কারণে। তবু একটা দুরন্ত অভিমানে মনটাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। সেই পুঞ্জীভূত অভিমানটা নিঃশেষে ধুয়ে গেল গতকাল বিকেলে, নিতান্ত ঘটনাচক্রে ওঁকে মুখোমুখি দেখতে পেয়ে। উনি যে কাশী এসেছেন, এখানে আছেন, তাই তো জানতেন না সাবিত্রী। গতকাল দুর্গাবাড়ি, সঙ্কটমোচন ঘুরে তুলসী-মানস মন্দিরে এসে নিতান্ত দৈবক্রমে দেখা পেয়ে গেলেন। আর কী পরিবেশে! সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল ওঁর। বজ্রাহতের মত শুধু বলেছিলেন: তুমি!

সাইকেল রিকসাতেই ঘুমন্ত নিতুনকে কোলে নিয়ে বসেছিল পাণ্ডাজীর ছেলেটি। উনি একাই এগিয়ে এসেছিলেন মন্দির-দর্শনে। সামনেই জুতো রাখার জায়গা। চটিজোড়া খুলে দিতেই বুড়োটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল। একটা পিসবোর্ডের চাকতি ধরিয়ে দিল অন্যমনস্ক

ভাবে। তখনও খেয়াল হয়নি। আসলে উনি তাকিয়েও দেখেননি বুড়ো লোকটার দিকে। হঠাৎ নজর হল, ওঁর দিকে পাশ ফিরে লোকটা একটা খাতায় কি লিখছে। বুড়োর মনটা খাতায় নিবদ্ধ বলেই সে চোখ তুলে তাকায়নি মাইজীর দিকে। ঐ খাতাটা দেখেই চমকে উঠেছিলেন সাবিত্রী। খাতার হিজিবিজি চিহ্নগুলো যে ওঁর খুবই পরিচিত। তখনই দুজন দুজনকে দেখতে পেলেন।

: তুমি !···তুমি !···তুমি জুতো পাহারা দাও !!

উঠে দাঁড়িয়েছেন বৃদ্ধ ততক্ষণে : কবে এসেছ কাশীতে ? ওরা আসেনি ? ওরা কোথায় ?

সে-কথার জবাব না দিয়ে সাবিত্রী বলেছিলেন, উঠে এস তুমি।

: তাই কি পারি ! এখনও পনের জোড়া জুতো চটি রয়েছে যে। ওরা মন্দির দেখে ফিরে এসে কার কাছে ফেরত নেবে ? গচ্ছিত সম্পদ—

চোখ ফেটে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়েছিল সাবিত্রীর। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, কার উপর অভিমান করে এ কাজ করছ ? তুমি তো বি. এস্.-সি. পাস ! কাকামণি বলতেন—আমি তোমার সর্বনাশ না করলে তুমি ঈশান স্কলার হতে, আই. সি. এস. হতে···ছি ছি ছি···শেষে তুমি সাত জাতের মানুষের জুতো--

বৃদ্ধ থামিয়ে দেন, চুপ, চুপ ! কী পাগলামি করছ ! রাস্তার মাঝখানে···

সাবিত্রী আঁচলে মুখ ঢাকেন। সামলে নিয়ে বলেন, বেশ। ঘণ্টাখানেক পরে আমি ফিরে আসব। আর জুতোর দায়িত্ব নিও না। কোথায় থাক তুমি রাত্রে ?

: দিন পনের ধরে আছি চকের কাছে ঘনশ্যামদাস ধর্মশালায়। কেন ?

: ফিরে এসে যদি তোমাকে না পাই, তাই জেনে রাখছি।

হাসলেন বৃদ্ধ। বললেন, ফিরে এসে এখানেই পাবে আমাকে।

তোমার জন্য অপেক্ষা করব আমি। ভয় নেই।

তাই ছিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে এসে দেখেন, জুতোর বোঝা নেমেছে। অঙ্কের বোঝা তখনও নামেনি। প্রশ্ন করেছিলেন, কার জন্য অঙ্ক কষছ! ছাত্র পড়াও এখনও?

: না! ঐ বি. এইচ. য়ু-র ছেলেরা দিয়ে যায়। সারা দিন তো চুপ-চাপ বসেই থাকি; তবু সময়টা কাটে।

: খাও কোথায়?

সে কথার জবাব দেননি। বলেছিলেন, চল, তোমাকে ছগনলালের ডেরায় নিয়ে যাই।

: ছগনলাল! সে কে?

: ঐ ধর্মশালার দারোয়ান। দেশে গেছে। ঘরের চাবিটা আমাকে দিয়ে গেছে।

ধর্মশালায় ফিরে অনেক গল্প করলেন, একবারও উচ্চারণ করলেন না ওদের নাম—টনি, সুরমা, অতসী, সনৎদের নাম। নিতুনকে অবশ্য উনি চেনেন না। উনি যখন গৃহত্যাগ করেন তখনও নিতুন জন্মায়নি। বরং কথাপ্রসঙ্গে বলে ফেলেছিলেন, আজুটার জন্য এখনো আমার বুকের মধ্যে হু হু করে ওঠে, জান? অথচ ওর কথা তো আগে মনেই পড়ত না।

আজু! আর্যভট্ট! সত্যবানের প্রথম সন্তান। বাপের দেওয়া নাম-টাই শুধু নয়, বাপের নামও রেখেছিল সে। দ্বিতীয় সন্তানের নামও সত্যবান দিয়েছিলেন—নিউটন। সে এখন টনি। ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় নিজেই নাম সই করেছিল টনি চক্রবর্তী। তাই তো হবে, নিউটন সে হতে চায়নি। অঙ্ক তার ভাল লাগত না। ও নিয়েছিল হিউম্যানিটিজ। অঙ্ক বাদে। শেষ সন্তানের নামকরণ করেছিলেন সাবিত্রী: অতসী।

এদের মধ্যে একমাত্র আর্যভট্টই শুধু ছিল বাপের মত। অঙ্ক-পাগল। ম্যাট্রিকে তুটো লেটার পেয়েছিল—আটানব্বই আর তিরা-

নব্বই—অ্যাডিশনাল আর কম্পালসারি ম্যাথমেটিক্সে। এদিকে পাস করল সেকেণ্ড ডিভিসনে। হবে না? ইংরাজী, হিন্দি দুটোতেই যে কাঁচা। বাংলা পড়েইনি। পরীক্ষা দিয়েছিল যমুনাবাঈ বয়েজ স্কুল থেকে। কিষেণগড়েই। আই. এস.-সিতেও অঙ্কে সাতানব্বই—কিন্তু ইংরাজী-বাংলায় টেনেটুনে। ভেবেছিলেন, বাজিমাৎ হবে বি এস.-সি তে। তাই হবার কথা। এখন আর সাহিত্য নেই—অঙ্কের রাজ্য। যথারীতি অঙ্কে অনার্স। জোর করে ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতায়। প্রেসিডেন্সিতে। থাকত ইডেন হস্টেলে। আর্যভট্ট নিজে অবশ্য অতটা বিশ্বাস করতে পারেনি, কিন্তু প্যারাবোলা-স্যার প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন: ঈশান স্কলার না হলে দুঃখ পাব, ফার্স্ট না হলে মর্মাহত হব, আর ফার্স্ট ক্লাস না পেলে ওর মুখদর্শনই করব না জীবনে!

ঐ যে অলক্ষ্যে বসে আছেন না এক ভদ্রলোক?—যাঁর আঁকে ভুল হয় না, কথাটা শুনে তিনি হেসেছিলেন। হাসলে কি হবে? প্যারাবোলা-স্যারের কথার খেলাপ হয়নি। আর্যভট্ট ফার্স্ট ক্লাস পায়নি, প্যারাবোলা-স্যারও তার মুখদর্শনও করেননি জীবনে।

আজুর নামের পাশেও ইংরাজী বর্ণমালার চতুর্দশ বর্ণটি লেখা হয়নি। লেখা হয়েছিল এ্যালফাবেটের সেই আদি অকৃত্রিম প্রথম অক্ষরটিই। পরীক্ষায় আদৌ অবতীর্ণ হয়নি আর্যভট্ট চক্রবর্তী।

ফোর্থ ইয়ারের শেষাশেষি সে মারা যায়। টাইফয়েডে।

সেই কথাই বলেছিলেন সত্যবান, ছগনলালের ঘরে ধর্মপত্নীকে: জান সাবি, তখন মনে হয়েছিল এটাই বুঝি আমার জীবনের প্রচণ্ডতম আঘাত! মনে আছে, নিজে হাতে ওকে পুড়িয়ে যখন ফিরে আসছিলাম তখন মনে মনে বলেছিলাম, ঈশ্বর! এমন আঘাত তুমি আর কাউকে দিও না! সেই খণ্ডমুহূর্তে আমি ভুলে গিয়েছিলাম—ঈশ্বর বলে কেউ আছেন কিনা তার প্রমাণ নেই; এবং থাকলেও তিনি কারও কথায় কান দেন না! তিনি একজন নিষ্ঠুর ম্যাথমেটি-

শিয়ান। অঙ্কের হিসাবে চলে তাঁর বিশ্বপ্রপঞ্চ!

: তুমি বলতে চাও ঈশ্বর নেই? সাবিত্রী জানতে চান।

সত্যবান বলেন, আমি জানি না। কথা সেটা নয় সাবি, আমি বলতে চাইছিলাম, সেদিন আমার মনে হয়েছিল আর্যভট্টের মৃত্যুটাই আমার জীবনের চরমতম আঘাত! আজ জীবনের সায়াহ্নে মনে হচ্ছে সেটা অকিঞ্চিৎকর। মৃত্যু তো জীবনের অপরিহার্য দোসর। তার চেয়ে বড় আঘাত—যখন মাথা হেঁট হয়ে যায়—চরমতম আঘাত পেলাম জীবনে...

মাঝপথেই থেমে গেলেন। সাবিত্রী বলেন, কি হল? থামলে কেন?

: না, থাক। সাবি, আজ বড় আনন্দের দিন। কী পাইনি তার হিসাব মেলাতে আজ আর মন চাইছে না।

: না, বল তুমি। সবচেয়ে বড় আঘাত কবে পেলে? সেই যেদিন আমি ছোট-খোকাকে ডেকে বললাম—তোমার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে পারব না?

: না। সে তো আমার কৃতকর্মের কর্মফল। ইকোয়াল অ্যাণ্ড অপোসিট রিয়্যাকশন!

: তবে? দশাশ্বমেধঘাটের সেই নিষ্ঠুর সন্ধ্যা? অতুর হাত চেপে ধরেছিলে যখন?

: তুমি কেমন করে জানলে?

: অতু বলেছিল সব কথা—

মাথা নাড়লেন সত্যবান। স্বীকার করলেন না স্ত্রীর কাছে—সেই সন্ধ্যার নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে অতসীর কিছুই ধারণা নেই, সে আবার কি বলবে? কথা ঘোরালেন। বললেন, জানো, তোমাদের কথা এ পাঁচ বছরে ক্রমে ক্রমে ভুলে গিয়েছিলাম। জোর করে মনকে নির্লিপ্ত করেছিলাম। মনকে বোঝাতাম, এ আমার প্রায়শ্চিত্তের দণ্ডভোগ। একা এ বোঝা বইতে হবে আমাকে। কিন্তু...বিশ্বাস কর সাবি,

একা বইতে হয়নি। এ পাঁচ বছর আমার পাশে পাশে ছিল সে—

: সে ! কার কথা বলছ ?

. আজু। সে রোজ আসে। ধমক দেয় : বাবা তুমি এমন করলে কেমন করে চলবে ? সকাল থেকে মুখে কিছু দাওনি, পিত্তি পড়বে না ? যাও, স্নান করগে।···আবার যখন ঐ বি-এইচ-য়ুর ছেলেদের দেওয়া অঙ্ক কষি তখন ও এসে বসে আমার কোল ঘেঁষে ; হেসে ওঠে : এটা কি করলে বাবা ? ইন্‌টগ্রাল ক্যালকুলাস ভুলে গেছ তুমি ! ··আবার রাত্রে যখন এসে শুই, ও সেই ছেলেবেলার মত ঝুপ করে এসে শুয়ে পড়ে আমার পাশটিতে—

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল সাবিত্রীর : তুমি ওকে দেখতে পাও ?

: না না, দেখতে পাই না। কিন্তু বুঝতে পারি--ও এসেছে, আমার কাছেপিঠেই আছে। অনেকটা ঐ 'আই'য়ের মত, তাকে ধরাছোঁয়া যায় না, অথচ সে কাজ করে যায়।

: I ? মানে 'আমি' ?

: না গো। I নয়, ছোট হাতের i, মানে 'রুট-ওভার মাইনাস ওয়ান'। যার বাস্তব অস্তিত্ব নেই, অথচ যাকে বাদ দিলে অঙ্কশাস্ত্র বেকার : ইম্যাজিনারি কোয়ান্টিটি !

এতক্ষণে সেই চিরাচরিত দাম্পত্য-আলাপের রেকারিং ডেসিমেলে ফিরে এসেছেন সাবিত্রী। বলেন, কী বকছ পাগলের মত। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না।

: এ যে বোঝানো যায় না সাবি, এ অনুভূতির জগৎ।

অন্য প্রসঙ্গ তোলেন : তা এত এত কাজ থাকতে জুতো পাহারা দেবার কাজটা নিলে কেন ?

: আমি যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি, সাবি। দিল্লীশ্বরের দণ্ডাদেশ ভোগ করছি।

: কিন্তু এত এত মন্দির থাকতে তুলসীমানস মন্দিরে কেন ? কেন নয় বিশ্বনাথে, কেদারে, দুর্গাবাড়িতে, সঙ্কটমোচনে ?

: তুমি তো জান, আমি নিরীশ্বরবাদী। তাছাড়া তুলসীদাসের প্রতি অন্য কারণেও একটা আকর্ষণ ছিল আমার?

: কী সেটা?

: তুলসীদাসও ব্রাহ্মণ সন্তান। তরুণ বয়সে বিবাহ করেন রত্নাবলীকে। সন্তানও হয় : তারক! জীবনসঙ্গিনীকে এত ভালবাসতেন যে একদণ্ডও তাঁকে না দেখে থাকতে পারতেন না। তাঁকে বাপের বাড়িও যেতে দিতেন না। একবার শ্বশুরের নিতান্ত অনুরোধে স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠাতে বাধ্য হলেন। রত্নাবলীর বাপের বাড়িতে কী একটা উৎসব ছিল। তুলসীদাস স্ত্রীর জন্যে কিনে আনলেন বেনারসী শাড়ি। তারকের জন্য চীনাংশুকের বস্ত্র। হাতী অবশ্য নয়, পালকি করে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন বাপের বাড়ি। কিন্তু ঘরেও থাকতে পারলেন না। পালকি বাহকদের পিছু পিছু ছুটতে থাকেন। পথের লোকে টিট্‌কারি দিতে থাকে স্ত্রৈণ মানুষটার বেহায়াপনায়। নিদারুণ লজ্জায় পালকির দ্বার খুলে রত্নাবলী মৃদু ভর্ৎসনা করলেন স্বামীকে। বললেন, হায়! এই অনুরাগ যদি তোমার ভগবানে থাকত তাহলে তুমি তরে যেতে।···প্রচণ্ড আঘাত পেলেন তাতে। নির্জন ঘরে ফিরে এলেন তুলসীদাস। মনে মনে বললেন, ঠিকই তো! এর চেয়ে ভগবানকেই ভালবাসি না কেন! সংসারী তুলসীদাস হয়ে গেলেন সাধক তুলসীদাস। গৃহত্যাগ করলেন সে রাত্রেই।···শোনা যায়, তিনি একবার গঙ্গাতীরে এক করুণ দৃশ্য দেখে বিচলিত হন। একজন মৃতকল্প অন্তর্জলি-স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে একটি রমণী রোদন করছে। সে সহমরণে যাবে। সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। তুলসীদাস সেই মেয়েটিকে দীক্ষা দেন এবং তার মৃতকল্প স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলেন।···এ সংবাদ সর্বত্র রটে যায়। এমনকি দিল্লীশ্বর আকবর এ কথা শুনে তুলসীদাসকে অনুরোধ করেন অমন একটি অলৌকিক ক্ষমতা দেখাতে। তুলসীদাস অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। তুলসীদাসের শিষ্যরা বলে, গুরুদেব, কেন আপনি দিল্লীশ্বরকে

সন্তুষ্ট করলেন না? তুলসীদাস বলেন, জগদীশ্বরকে সন্তুট করতে!···
তাই তো দণ্ডভোগ করতে আমি এসে বসেছি তুলসীমানস মন্দিরে।
জগদীশ্বরকে আমি চিনি না—তিনি বহু দূরের; কিন্তু তুলসীদাস
আমার কাছের মানুষ। জানি না, আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ
কিনা। এ বোঝানো যায় না। এ অনুভূতির জগৎ!

তা সত্যি। বোঝানো যায় না। সাবিত্রীই কি পেরেছেন তাঁর
স্বামীকে বোঝাতে--তাঁর ব্যথা, তাঁর বেদনা? সারাটা জীবনভর?
দীপের মত জ্বলেছেন- -অন্ধ মানুষটা দেখতে পায়নি তার আলো;
ধূপের মত পুড়েছেন, অঙ্কপাগল মানুষটা পায়নি তার সৌগন্ধ্য। হয়তো
একই অভিযোগ ছিল সাবিত্রীর—কে জানে? পনের বছরের চাকরি
যেদিন এক কথায় ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন, ইস্তফা দিলেন
যমুনাবাঈ স্কুলের এ্যাসিস্টেট হেডমাস্টার, তখন সারা কিষেণগড়ের
মানুষের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কি সাবিত্রীও বলেননি. তিনি নির্বোধ?
সেটা কত সাল? উনিশশো আটান্ন।

আজ তার অনেক আগেই মারা গেছে। টনি তখন ক্লাস এইট-এ
পড়ে, অতসী ফাইভে। কিষেণগড়ে ইতিমধ্যে মেয়েদের স্কুল
খুলেছেন বাবু-সাহেব। না, প্যারাবোলা-স্যারকে যিনি কিষেণগড়ে
এনেছিলেন তিনি নন। তিনি মারা গেছেন; তাঁর গদিতে উঠে
বসেছেন নতুন যুগের নতুন বাবু-সাহেব রামসুভগ সিং! এই
এলাকার তরুণ এম. এল. এ. তিনি। সত্যবানের ছাত্র। শুরু হল
কুরুক্ষেত্রের দ্রোণ পর্ব। লড়াই বাধল গুরু-শিষ্যে। অবশ্য মহা-
ভারতের সেই ট্রাডিসন মেনে প্রথম পর্বেই গুরু-শিষ্যে লড়াইটা
বাধেনি। প্রথম দিকে সত্যবানের ভূমিকা ছিল অন্যরকম, অনেকটা
ভীষ্মপর্বে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা। এ যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না বলে
প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। স্বয়ং কৃষ্ণই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেননি,
সত্যবান পারবেন কেমন করে!

বিরোধটা বাধল একটা বিচিত্র কারণে। বিহার সরকার আদেশ

জারা করলেন, একটি ন্যূনতম হারে শিক্ষকদের বেতন দেওয়া না হলে সরকারী অনুদান মিলবে না। কিষেণগড়ের যমুনাবাঈ হাইস্কুলে শিক্ষকদের যে-হারে বেতন দেওয়া হত, সেটা সরকারী নির্দেশের অনেক কম। এই নিয়েই বিরোধ। বাবু-সাহেব শিক্ষকদের ডেকে বললেন, স্কুলের যা আর্থিক অবস্থা তাতে বর্ধিত হারে বেতন দেওয়া চলে না। এ কথা নিশ্চয়ই বোঝেন আপনারা, অথচ সরকারী অনুদানটা হাতছাড়া হলেও সমূহ ক্ষতি। এর একটি মাত্র সমাধান আছে। আপনারা যা মাইনে পাচ্ছেন তাই পাবেন, কিন্তু খাতায় সই করতে হবে সরকারী নির্দেশে যে হার আছে সেই অনুপাতে। উপায় কি বলুন ?

স্বভাবতই যা হওয়ার কথা তাই হল। এঁরা রাজী হলেন না। কথা-কাটাকাটি, মিটিং, বৈঠক। শেষবেশ মাস্টারমশাইরা স্থির করলেন —প্রতিবাদ জানাতে তাঁরা ধর্মঘট করবেন। সবসম্মতিক্রমে কিন্তু সে সিদ্ধান্তটা নেওয়া গেল না। একমাত্র বিরুদ্ধ ভোট পড়ল সত্যবান চক্রবর্তীর। তিনি বললেন, নীতিগতভাবে আপনাদের সমর্থন করছি আমি। যা মাইনে বাবদ পাব খাতায় তার বেশি লিখব কেন ? কিন্তু প্রতিবাদটা আপনারা যেভাবে জানাতে চান, তাতে আমার সায় নেই। ঝগড়াটা হচ্ছে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষকদের, ছাত্ররা কেন তার ফলভোগ করবে ? আমরা যদি ক্লাস না নিই তাহলে ওদের কোর্স শেষ হবে না। ওরা পরীক্ষায় খারাপ করবে। ওদের কী দোষ ?

অন্যান্য মাস্টারমশাই, মায় স্বয়ং হেডমাস্টার ওঁকে সকাল-বিকেল বোঝাতে থাকেন, এই হচ্ছে এ যুগের নিয়ম। সোজা আঙুলে ঘি তোলা যায় না। ছাত্রদের অসুবিধা হলেই অভিভাবকদের টনক নড়বে। তারা স্কুল-ইন্সপেক্টরের কাছে দৌড়বে, এস. ডি.ও. সাহেবের কাছে দরবার করবে। তখন তদন্ত হবে। আর সেই তদন্তে যাতে আসল কথা ফাঁস না হয়ে যায় তাই বাবু-সাহেব শিক্ষকদের সঙ্গে রফা করতে বাধ্য হবেন। কিন্তু কিছুতেই রাজী হলেন না সত্যবান। ধর্মঘট

হল। একা সত্যবান প্যারাবোলা ছাতা-বগলে স্কুলে গেলেন। একেবারে একা। মায় দারোয়ান-বেয়ারাগুলো পর্যন্ত অনুপস্থিত। কুছ্ পরোয়া নেই। উনি সোজা চলে গেলেন ক্লাস টেন-বি সেকশনে। দরজার বাইরে থেকেই হাঁকাড় পাড়েন : 'সিডাউন, সিডাউন বয়েজ, নাউ টেক ডাউন—'

অভ্যাসবশে বোর্ডের দিকে এগিয়ে যেতে পারেননি। ক্লাসে একটিও ছেলে নেই। যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর! সেদিন বিকেলে দল বেঁধে এল ছেলেরা ওঁর বাসায়। জানকীপ্রসাদ শর্মা তাদের মুখপাত্র। ছেলেটি ফার্স্ট বয়, সত্যবানের প্রিয়পাত্র। বললে, স্যার, কিছু মনে করবেন না, এ কিন্তু আপনি ঠিক করছেন না। আপনারও উচিত ধর্মঘটে সামিল হওয়া।

: কিন্তু তোমরা কেন বঞ্চিত হবে? তোমাদের কি দোষ?

: ঐখানেই তো ভুল হচ্ছে স্যার আপনার। আপনারা আর আমরা কি আলাদা? আমাদের নিয়েই তো আপনি, আপনাদের নিয়েই তো আমরা। আপনিই না সেদিন বলেছিলেন, উপনিষদকার বলেছেন : 'ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু......তেজস্বি নাবধীতমস্তু'- -সর্বত্রই 'নৌ', গুরুশিষ্য উভয়ে একত্রে!

: হ্যাঁ, তা তো বটেই, কিন্তু তোমাদের সিলেবাস···

: আমরা বাড়িতে আপনার ক্লাস করব—

তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হয়েছিলেন প্যারাবোলা-স্যার। সামিল হয়েছিলেন ধর্মঘটে।

ঝামেলা কিন্তু এখানেই মিটল না। বরং এখানেই শুরু হল ভীষ্ম-পর্বের পরবর্তী পর্ব। স্কুলের প্রেসিডেণ্ট এলেন মিটমাট করতে। মিটমাট হল। মাঝামাঝি রফা। অর্থাৎ সকলেরই কিছুটা মাইনে বাড়ল এবং সকলেই স্বীকৃত হলেন সরকার-নির্দেশিত অঙ্কে মাইনে পাচ্ছেন বলে মিথ্যার সঙ্গে রফা করে সই দিতে।

এবং সেখানেই বাধল চরম সংঘাত। এ-ভাবে আপোষ করতে

রাজী হলেন না সত্যবান। এতদিন যাঁরা ওঁকে অসহযোগে সামিল হতে অনুরোধ উপরোধ করছিলেন এবার তাঁরাই এলেন সহযোগে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে। আর এবার তিনিই একা ধর্মঘট করতে চাইলেন। একা ধর্মঘট হয় না, অনুপস্থিত হওয়া যায় মাত্র। যথারীতি হেডমাস্টাব মশাই লিখিত কৈফিয়ত চাইলেন। লিখিত জবাব দাখিল করলেন সত্যবান-প্যারাবোলা। সে কৈফিয়ত পড়ে কান লাল হয়ে উঠেছিল হেডমাস্টার মশায়ের। কিন্তু তিনি কোনও ব্যবস্থা নিলেন না। নিতে দিলেন না বাবু সাহেব। তিনি বললেন, ব্যাপারটা আমার ওপব ছেড়ে দিন।

বাবু-সাহেব এলেন সত্যবানেব ছাপরায়। বললেন, মাস্টারসা'ব, আপনাকে আমাব বাবা এনেছিলেন এ স্কুলে। আপনাকে তো আমি ছেড়ে দিতে পারি না। তাই নিজেই এসেছি ফয়শালা করতে।

: কী ফয়শালা করবে রামসুভগ? আমি ওতে রাজী নই।

: জানি স্যার। তাই আমি একা এসেছি। কথাটা গোপন। আপনাকে আমি পুরো মাইনে দেবো। কিন্তু কথাটা গোপন রাখতে হবে। আমি জানি, আপনি ইমানদার আদমী, দুশো টাকা বেতন নিয়ে, তিনশো টাকার ভাউচাবে সই দিতে পারেন না। বাকি একশো প্রতি মাসে গোপনে আমাব লোক আপনাকে দিয়ে যাবে।

ছাত্রেব এ অঙ্ক গুরু বুঝতে পারলেন না। স্বীকার করলেন অক্ষমতা : মানে?

হাসলেন নয়া বাবু-সাহেব : মাস্টারসাব, আপনি মানুষ না আছেন, দেওতা আছেন। সমঝ্‌লেন না? আপনাকে হামি সরকারী স্কোলে পুরা বেতন দিচ্ছি এ কোথা জানলে বহ্‌সব মাস্টর ভী হমার জান নিকলে দেবে না? ইয়ে অ্যারেঞ্জমেন্ট শ্রিফ্‌ হামাব আপনার আছে।

এতক্ষণে প্রণিধান কবেছেন তত্ত্বটা। বলেন, হঠাৎ আমার উপর এত করুণা কেন?

: মাফ কিজিয়ে মাস্টারসাব, আপনি হমাকে মানুষ করেছেন, বহ্ বাৎ কি ম্যয় ভুল্‌তে পারে ?

সত্যবান কঠিন স্বরে বলেছিলেন, না বাবা রামস্বুভগ, মানুষ করতে পারিনি তোমাকে। তুমি আস্ত একটা বাঁদর হয়েছ। তোমার স্কুলে আমি আর থাকব না। আজই পদত্যাগ করছি।

বাবু সাহেব একজন রীতিমত সম্মানিত মানুষ, এ তল্লাটের বিধান-সভার সদস্য। এরপর তিনি আর কথা বাড়াননি।

আবার বিদায় পর্ব। আবার সেই ছেলেরা সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। অশ্রুসজল চোখে।

প্যারাবোলা-স্যার দীর্ঘ পনের বছর কিষণগড়ে কাটিয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। ঘটনাচক্রে ভাড়াটে উঠে যাওয়ায় অমৃতলাল ব্যানার্জী রোডের বাড়িটা খালি ছিল।

কলকাতায় ফিরে এসে বোধহয় ভুলই করেছিলেন। গাঁয়ে থাকলে হয়তো নিউটন টনি হয়ে যেত না। কলকাতার স্কুলে ভর্তি হয়েই সে অন্য মানুষ হয়ে গেল। আজু ছিল বাপের ন্যাওটা, নিউটন মা-চেংটি। অঙ্ক তার ভাল লাগত না, অঙ্কের প্রতি তার জাত-ক্রোধ। সে বিরাগের উৎস অঙ্ক নয়, বুঝতেন সত্যবান, সে বিদ্বেষ 'ফাদার-ইমেজে'র বিরুদ্ধে। মাকে সে ভালবাসে, তাই অঙ্ককে সে দেখেছিল বিমাতার রূপে। বাপের পাগলামোতে মাকেই ভুগতে হয়েছে সবচেয়ে বেশি,—মাকে, অতসীকে এবং তার নিজেকে। তাই ঐ বয়স থেকেই মনে মনে সে পিতৃবিরোধী হয়ে ওঠে। বাপের সঙ্গে একটা 'জেনারেশান গ্যাপ' প্রতিনিয়ত অনুভব করে। পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে মস্তানি করায় হয়তো সে সত্যই আনন্দ পেত না, কিন্তু তাতে যে বাবা মর্মাহত হয়, এটুকু বুঝেই তার আনন্দ। নিজের ভাল লাগে বলে নয়, বাবা কী কী অপছন্দ করে তা বুঝে নিত, আর সেগুলোতেই একে একে অভ্যস্ত হতে থাকে। রাত করে বাড়ি ফেরা, নাইট শোতে সিনেমা দেখা, সিগারেট খাওয়া, মাথায়

তেল না দেওয়া, চোঙা প্যান্ট পরা, ইত্যাদি ইত্যাদি !

পিতাপুত্রে ব্যবধান ক্রমেই দীর্ঘতর হতে থাকে। প্রত্যক্ষ সংঘাত কখনও যে বাধেনি কারণটা ঐ। এক হাতে তালি বাজে না। সত্যবান ঝগড়া করতে জানেন না। সহ্য করতে জানেন। আর তাই সংগ্রাম যখন বাধল তখন উনি চক্কোত্তি পাথরের মত শক্ত হয়ে রইল। পিতাকে নির্বাসনদণ্ড দিতে তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে দেখা যায়নি। ততদিনে সে প্রতিষ্ঠিত। বিয়ে করেছে—প্রেম করে। শ্বশুরই ঢুকিয়ে দিয়েছেন চাকরিতে। উপার্জন করছে। অতসীর বিয়েও হয়ে গেছে। সুরমা এ সংসারে তখন সদ্য এসেছে। নিজের সংসার, নিজের রোজগার হয়েছে – এখন আর ক্ষমা করার প্রশ্ন ওঠে না। সুযোগ হয়ে গেল যখন মা নিজে থেকেই বললে, ছোটখোকা, মনস্থির কর। হয় তোর বাপ, নয় আমি। একজনকে বিদায় দিতে হবে। এক ছাদের নিচে আমরা থাকতে পারব না।

ঘাড়ে হাত দেয়নি, কিন্তু একরকম পাগলটাকে বিদায় করে দিয়েছিল।

এমন কি শরৎ স্টেশান থেকে ফিরে এলে জানতে চায়নি কোথায় রেখে এল তাঁকে। শরৎও সে কথা বলেনি নিজে থেকে। একটা অপরাধ বোধে ভুগছিল সে নিজেও।
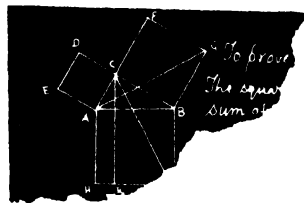
আশ্বিন-কার্তিক-অগ্রান-পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন।

ছ মাস পার হয়ে গেছে। দীপান্বিতার স্মৃতি প্রায় ঝাপসা হয়ে এসেছে। রঙ দোল সমাগত। এই ছ মাসে যেন দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে সত্যবানের। যে দিনটিকে আনন্দের বলে মনে হয়েছিল, এখন মনে হয় সেটাই সবচেয়ে বেদনার। স্বপ্ন বলে মনে হয় সে দিনের স্মৃতিকে। এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারেন না ঘটনাটা। সাবিত্রী ফিরে না আসায় যতটা আঘাত পেয়েছেন, তার চেয়ে বেশি বেজেছে তাঁর উদাসীনতায়। হয়তো কলকাতায় ফিরে গিয়ে তাঁর মন বদলে গেছে—তা তো হতেই পারে—কিন্তু সে ক্ষেত্রে একটা চিঠি তো তিনি লিখতে পারতেন? সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে!

ছগনলাল ফিরে এসেছে অনেকদিন। এসেছে সস্ত্রীক। সত্যবান ফিরে গেছেন তাঁর সেই নিষিদ্ধপল্লীর আবাসে। পিয়ারীবাইয়ের হেপাজতে। পিয়ারীর সেই পিতৃপরিচয়হীন শিশুটিই কি তাঁকে শেষ পর্যন্ত জড়ভরতে রূপান্তরিত করবে? সংসারের মায়া কাটিয়ে উঠতে দেবে না? ফিরে এসেছে সেই অভ্যস্ত জীবনের পৌনঃপুনিকতা। সকালে গঙ্গাস্নান, পিয়ারীর অন্নগ্রহণ, পাঠশালার ক্লাস, তুলসীমানস মন্দিরে জুতো পাহারা দেওয়া আর বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের দেওয়া আঁক কষা।

কিন্তু ঠিক সেই জীবনটা ফিরে পাননি এবার। জীবনের যে পর্যায়টিকে দিব্যি ভুলে গিয়েছিলেন, সাবিত্রী এসে সেই নিষিদ্ধ দ্বারটা যেন হাট করে খুলে দিয়ে গেল। এখন সেই যন্ত্রণাদায়ক পর্যায়টা বারে বারে ফিরে আসে স্মৃতিতে।...অতসীর বিবাহ...সপরিবারে

বেড়াতে যাওয়া···উলুবেরিয়ায় দুর্ঘটনা···হাসপাতাল, কোর্ট-কাছারি ···পুলিসের জেরা! তাঁর বিচার···দণ্ডদান···গৃহত্যাগ! আর দশাশ্বমেধঘাটের সেই বেদনাদায়ক সন্ধ্যার স্মৃতি! এগুলোই ফিরে ফিরে মনে পড়ে। রাতে ঘুম হয় না। দিনে মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যান। কেন সাবি তাঁকে এভাবে মিথ্যা স্তোক দিয়ে গেল? ঘটনাচক্রে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন সেই পঞ্চদশী কুমারীকে ; কিন্তু তিনি তো তুলসীদাসজীর মত তার তিরস্কারে গৃহত্যাগ করেন নি। হ্যাঁ, স্বীকার করেন জীবনে জীবন যোগ করা হয়নি—তাঁরা ভিন্ন পথের পথিক ; কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদা তো তিনি আজন্ম মিটিয়ে দিয়েছেন। তার উপেক্ষাও সয়েছেন, তার সিদ্ধান্ত মেনে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাহলে কেন সে সেদিন এমন মিথ্যার কুহক দিয়ে ওঁর মানসিক শান্তিটুকুও কেড়ে নিয়ে গেল? কেন? কেন? কেন?

আর সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে—সেই দিনটি থেকে আজু আর আসে না। আজুর উপস্থিতি টের পান না প্রতি পদক্ষেপে। সেও কি এতদিনে অভিমান করে মুখ ফেরালো?

ফাল্গুন শেষ হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে মনকে এতদিনে সংযত করেছেন। বুঝিয়েছেন নিজেকে—সাবিত্রী কলকাতায় ফিরে গিয়ে বুঝতে পেরেছিল তার মূর্খামি। বেচারি সে-কথা স্বীকার করে কোন্ লজ্জায়! সত্যবান নিজেও চিঠি লিখতে পারতেন—কিন্তু তাতে তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়া হবে। আহা, সে সুখেই থাক। উনি আর কদিন? মাঝে মাঝে গিয়ে বসেন মণিকর্ণিকার ঘাটে।

তারপর একদিন।

পড়ন্ত বেলায় বসেছিলেন তুলসীমানস মন্দিরের সামনে, জুতোর পাহারায়। একজোড়া দম্পতি এসে নামল রিক্‌শা থেকে। বাঙালী নয় বোঝা যায়। কতই বা বয়স মেয়েটির? ত্রিশ হয় কি না হয়। হাই হিল জুতোজোড়া তুলে দিল ব্রাহ্মণের হাতে। পিচবোর্ডের টিকিট ধরিয়ে দিলেন তাকে। তারপরেই ছেলেটি। তার পা থেকে

জুতো খুলে নিতে হাত বাড়িয়েছেন, হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সরে গেল ছেলেটি। স্থির দৃষ্টিতে দেখতে থাকে ওঁকে।

বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বয়স। টেরিলিনের প্যাণ্ট আর বুশসার্ট, পায়ে কাবলি চপ্পল। সরু গোঁফ। চোখে রোদ-নিবারক চশমা। সেটা খুলে ভাল করে দেখল ওঁকে। বললে, মাফ্ কিজিয়ে, ক্যা নাম আপ্‌কা?

সত্যবান ওকে চিনতে পারেননি। তবে বুঝেছেন ঠিকই। ছাত্র। কোথাকার? কী জবাব দেবেন বুঝে উঠতে পারেন না। মিথ্যে বলতে পারলে কত সুবিধা হয় জীবনে!

: কহিয়ে জী? কভি আপ্ কিষিণগড় মে থে? বিহার মে···

উপায় নেই। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছেন। হিন্দীতে প্রশ্ন করেন, কোন বছর তুমি ম্যাট্রিক পাস করেছিলে? যমুনাবাঈ স্কুলে পড়তে তো?

ছেলেটি স্তম্ভিত। অস্ফুটে বলে: মাস্টারসা'ব!

হাসলেন সত্যবান: কোন্ বছরের ব্যাচ?

তখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি। যন্ত্রচালিতের মত বললে, ফিফ্‌টি সিক্স্।

: রোল নম্বর কত?

মন্ত্রমুগ্ধের মত ছেলেটি বললে, এগারো।

মনে মনে সাপের মন্ত্র আওড়ালেন সত্যবান। তারপর হেসে বললেন, উঃ! তোমার চেহারা তো একদম বদলে গেছে লছমন-প্রসাদ!

টেরিলিনের প্যাণ্টে ধুলো লাগল। ছেলেটি প্রণাম করল ওঁকে। স্ত্রীকে বললে, আমার মাস্টারমশাই। মিস্টার···

মেয়েটিও ভীষণ অবাক হয়েছে। তবু স্বামীর অনুকরণে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। সত্যবান বললেন, কী লছমন, আমার নামটা ভুলে গেছ? 'মিস্টার' বলে থামলে কেন?

ছেলেটি বিব্রত। বললে, আপনাকে ভুলিনি, আমি তো আগেই

চিনেছি, কিন্তু আপনার নামটা কিছুতেই—

হাসলেন সত্যবান। মেয়েটিকে বললেন, শোন মা! লছমন ভুল বলছে! ও আমার ছাত্র নয়। আমার ছাত্র কখনও মিছে কথা বলে না। আমার নামটা—মানে যে নামে ওরা আমাকে উল্লেখ করত সেটা ওর নিশ্চয় মনে পড়েছে, স্বীকার করছে না।

ছেলেটি একগাল হাসল। বলল, ঠিক বলেছেন স্যার 'প্যারা-বোলা-স্যার' নামটা মনে আছে আমার, কিন্তু আপনার ভাল নামটা।

ওকে বুকে টেনে নিয়ে বৃদ্ধ বললেন, ওর চেয়ে ভাল নাম আমার নেই রে লছমন!

সেবার সাবিত্রীর বেলায় যা হয়েছিল এবারও তাই ঘটল। বরং লছমনপ্রসাদ আরও করিৎকর্মা। মন্দিরের পাশে যে খঞ্জ ভিখারীটি জুতো পাহারা দেয়, তার সঙ্গে মুহূর্ত-মধ্যে রফা করে নিজে হাতে জুতোর পাহাড় স্থানান্তরিত করল। তাকে একটি দু টাকার নোট বকশিশও দিল। দেখা যখন পেয়েছে তখন মাস্টারসা'বকে সে কিছুতেই ছাড়বে না।

ওর স্ত্রীও মানুষটা ভাল। এই উটকো ঝামেলায় সে বিব্রত হল না আদৌ। স্বামীর শিক্ষক, যদিও তিনি জুতো পাহারা দেন, তাঁকে সে শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করল। ওরা এলেন ওদের হোটেলে। তখনই কিনে আনল ধুতি, গেঞ্জি, চপ্পল। বললে, আপনি মুখ হাত ধুয়ে নিন, আমি দেখি, কিছু খাবারের যোগাড় করি। রত্না রইল—ও আপনার পুত্রবধূ। যা যা দরকার, তোয়ালে সাবান সব চেয়ে নেবেন।

রত্না নিজে থেকেই বললে, সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না—কিন্তু মাস্টারসা'ব কি খান না-খান জেনে নাও।

বৃদ্ধ বললেন, খাওয়ার ব্যাপারে আমার কোন বাছবিচার নেই। তবে অবেলায় বেশি কিছু খেতে পারব না।

স্নেহের অত্যাচার তাঁর ভালই লাগছিল। এ জিনিস অনেক, অনেক

দিন পাননি বলেই।

লছমন ছাড়ল না। দুরন্ত কৌতূহলই শুধু নয়, নিকট আত্মীয় যে ভাবে দাবী করে সেভাবেই সে জানতে চাইল সব কথা। এমন অবস্থা কেমন করে হল মাস্টারসা'বের। স্কুলে কেন চাকরি করেন না, কেন প্রাইভেট ট্যুইশানি করেন না, অন্তত দোকানের খাতা লেখা বা ঐ জাতীয় কাজও কি তিনি পাননি? গুরুপত্নী কবে গত হয়েছেন? মাস্টারজীর তো এক ছেলে—হ্যাঁ, নামটাও মনে আছে, নিউটন, সে কোথায়? সে বেঁচে আছে? আশ্চর্য! বাপকে দেখে না? মেয়েও তো ছিল একজন?

: না না, মাস্টারসা'ব। আপনি সব কথা খুলে বলুন আমাকে। নিউটনই কি আপনার একমাত্র পুত্র? লছমনপ্রসাদ কি কেউ নয়?

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন সত্যবান। বললেন, বলব, সব কথাই তোকে খুলে বলব রে লছমন, কিন্তু এক শর্তে!

: বলুন? শর্ত না শুনেই মেনে নিলাম।

: তোর সুখের সংসারে আমাকে টেনে নিয়ে যাবি না, বা কোন রকম অর্থ সাহায্য করবি না। কথা দে।

স্থির দৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ছেলেটি। তারপর—কোথাও কিছু নেই হঠাৎ প্রণাম করল আবার: বলুন?

মেলে ধরলেন সেই গ্লানিকর ইতিহাস:

বম্বে রোড ধরে চলেছে গাড়িটা। অ্যাম্বাসাডার। শরতের গাড়ি। ছ'জন যাত্রী। পিছনের সীটে সস্ত্রীক সত্যবান আর অতসী। সামনে জানলার ধারে টনি, মাঝে শরৎ এবং স্টিয়ারিঙে অতসীর বর সনৎ। সুরমা গাড়িতে নেই। ডাক্তার বারণ করেছেন। এ অবস্থায় এতটা মোটর জার্নি করা ঠিক নয়। প্রথমবার তো! সত্যবানও যেতে চাননি। পুত্রবধূর কাছে থেকে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁর আপত্তি টেকেনি। প্রথমত বেয়াই মশাই এসে সুরমাকে নিয়ে গেলেন, দ্বিতীয়ত

সনৎ কিছুতেই তাঁকে একা বাড়িতে থাকতে দিল না। নতুন জামাই, তার কথা ঠেলতে পারলেন না। ওঁরা যাচ্ছেন দীঘা, দিন দুয়েকের জন্য।

বালি ব্রীজ পেরিয়েই যখন শরৎ ছোটভাইকে স্টিয়ারিঙটা ছেড়ে দিল তখনই আপত্তি করেছিলেন সত্যবান। বলেছিলেন, না না, ওটা কোরো না। সনতের তো ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই—

শরৎ বলেছিল, কিছু ঘাবড়াবেন না তাঐমশাই। আমি তো পাশেই বসে আছি। এমন ফাঁকা রাস্তায় না চালালে হাত স্টেডি হবে কি করে?

সত্যবান সনৎকে প্রশ্ন করেছিলেন, অন্তত লার্নার্স লাইসেন্স করিয়েছ তো?

সনৎ জবাব দেয়নি। শরৎই বলেছিল, এইবার করাবে।

: না না, এ ঠিক হচ্ছে না। তোমার গাড়িতে 'এল' মার্কা প্লেটও নেই!

পিছনের সীটে বসে অতসী মনে মনে বলেছিল, কেদ্দানি দেখানো হচ্ছে বাবুর!

টনিও মনে মনে বলেছিল, এই শুরু হল বুড়োর টিক্‌টিক্। সারাটা রাস্তা জ্বালাবে!

মোট কথা ওঁর কথায় কর্ণপাত করেনি কেউ।

দুর্ঘটনাটা ঘটল উলুবেরিয়ার কাছাকাছি। রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে। টারম্যাক রাস্তার দু পাশেই কর্দমাক্ত বিশ্বাসঘাতক 'বার্ম', কাঁচা অংশ। সেখানে মাঝে মাঝে লরির চাকার গভীর খাদে ঘোলাটে জল তখনও জমে আছে। শরৎ একবার ভাইকে সাবধান করে বলেও ছিল, খবরদার কাঁচা রাস্তায় নামবি না। কিন্তু তাই নামতে হল। ওদিক থেকে মালবোঝাই একটা দৈত্যযান আধখানা রাস্তা চেপেই আসছিল। ওদের গাড়ির স্পিডোমিটারের কাঁটা তখন পঞ্চাশের ঘরে। বিপরীতমুখী গাড়ি দুটির দূরত্ব যখন প্রায় পঞ্চাশ গজ কোথা থেকে

ছুটে এল একটা বাছুর। লরীটা এদিকে চেপে পাশ কাটাতে চাইল খণ্ডমুহূর্তের সিদ্ধান্ত। সনৎ ব্রেকটা চাপতে গিয়ে ভুলে চাপ দিল অ্যাক্সিলেটারে। ডান বাঁ গুলিয়ে গেল তাঁর। শরৎ হুমড়ি খেয়ে স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে দিল। মুখোমুখি ধাক্কা লাগলো না, বাছুরটাও বেঁচে গেছে—কাঁচা রাস্তায় পড়ল সামনের চাকাটা। মাতালের মত টলে উঠলো গাড়িটা। সনৎ ডাইনে কাটিয়ে উঠতে গেল রাস্তায়; আর ঠিক তখনই দেখতে পেল—লরীর আড়ালে আসছিলেন যে ভদ্রলোক তিনি দু হাত তুলে আর্তনাদ করে উঠেছেন। ব্রেক. ব্রেক, ব্রেক। থামল বটে গাড়িটা কিন্তু তার আগে উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে সেই মানুষটি। ছিটকে গিয়ে পড়েছে রাস্তার ঢালু অংশে।

দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়িটা। সত্যবান আর টনি ছিলেন জানলার ধারে। ওঁরাই নামলেন প্রথমে। পরে একে একে আর সবাই। লোকটার জ্ঞান নেই, প্রাণ আছে। সনৎ থর থর করে কাঁপছে, তার মুখটা কাগজের মত সাদা। অতসী তার হাত ধরে টানছে—তোমাকে যেতে হবে না। বসো তুমি। জল খাবে?

সত্যবান বলেন, কাছেই উলুবেড়িয়া হাসপাতাল।

বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি শুধু শরৎএর। চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বললে, কুইক! উঠে আসুন সবাই গাড়িতে। ত্রিসীমানায় লোকজন নেই। কেউ দেখেনি! কুইক!

রুখে দাঁড়িয়েছিলেন সত্যবান, কী বলছ শরৎ? লোকটা বেঁচে আছে!

: বেঁচে আছে, কিন্তু মরবে। অহেতুক কেন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন? আসুন।

এবার অতসীও বললো, ঝামেলা হবে বলে আমরা চেষ্টাও করব না! জ্যান্ত লোকটাকে—

টনি ধমকে ওঠে, তুই থাম্! ওঠ্ গাড়িতে—

কিন্তু সত্যবানকে নড়ানো গেল না। ততক্ষণে তিনি আহত

অজ্ঞান মানুষটার কাছে এগিয়ে গেছেন। নাড়ি দেখছেন, নিশ্বাস পড়ছে কিনা পরীক্ষা করছেন। সনৎকে সামলাচ্ছেন সাবিত্রী।

মনস্থির করল শরৎ: ঠিক আছে। হাসপাতালেই নিয়ে যাব লোকটাকে, এস—

সত্যবান, টনি আর শরৎ ধরাধরি করে অচৈতন্য দেহটাকে শুইয়ে দিল পিছনের সীটে। তার মাথার কাছে বসলেন সাবিত্রী। টনি আব অতসী বসল সামনের সীটে। স্টিয়ারিংে এবার শরৎ। আব একবার দিগন্তপ্রসারী রাস্তার দু প্রান্ত এবং মাঠের দিকে দেখে নিয়ে বললে, কাক-পক্ষী ত্রিসীমানায় নেই। শোন্ সনৎ, আপনারাও শুনুন। গাড়ি চালাচ্ছিলাম আমি। গাড়িতে ছিলাম এই চারজনই। তাঐমশাই আব সনৎ আদৌ আসেনি। ফলো?

টনি বুঝেছে। অতসীও। সনতের মাথায় কিছুই ঢুকছে না তখন। সে শুধু দেখছে একটা আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ দু হাত শূন্যে তুলে গাড়ির সামনে আর্তনাদ করছে! শরৎ দ্বিতীয়বার বলল, সনৎ, কুড য়ু ফলো মী? 'এ্যাক্‌সিডেন্ট আমি করেছি! তোরা দুজন বাড়িতেই ছিলি। কিছুই জানিস না। মাঠ পাড়ি দিয়ে সোজা স্টেশনে চলে যা। নেক্সট ডাউন ট্রেনে কলকাতা। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেই মিস্টার ভগৎরামকে একটা ফোন করবি। বলবি বাড়ির সবাই দীঘা গেছে বেড়াতে, একা বাড়িতে ভাল লাগছে না। যা হয় খেজুরে আলাপ করে লাইন কেটে দিবি। টাইমটা নোট করিস। ঘণ্টাখানেক এদিক ওদিক হবে, তবু একটা অ্যালেবাই হয়ে থাকবে!

টনি বললে, মাঠ পার হয়ে স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে আরও দেরি হবে। ওরা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকুক না। কলকাতাগামী কোন বাস বা ট্রাক ধরে যদি ডানলপ ব্রীজের কাছ থেকে ফোন করে তাহলে আরও আধঘণ্টা সময় এগিয়ে যাবে।

ধমকে ওঠে শরৎ, সার্টেনলি নট! নেক্সট গাড়ি কী আসছে তা কে জানে? হাইওয়ে পেট্রল কারও হতে পারে! যা বললাম

কর। অ্যাণ্ড রিমেম্বার! গাড়ি আমি চালাচ্ছিলাম! তোরা এখনও কিছুই জানিস না!

পরমুহূর্তেই গাড়িটা নক্ষত্র বেগে রওনা হয়ে গেল।

সত্যবান দেখলেন নয়ানজুলির দিক থেকে একটা রক্তের ধারা সাইন-কার্ভের মত গোমুত্রিকা রচনা করে কালো পিচের রাস্তা পর্যন্ত এসেছে।

: আসুন। আমরা আলপথ ধরে স্টেশনের দিকে যাই। অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে সনৎ।

সত্যবান কোনও কথা বলতে পারলেন না। যন্ত্রচালিতের মত জামাইয়ের পিছন পিছন চলতে থাকেন নাড়ামুড়ো ভরা আলপথ দিয়ে বিসর্পিল পথে। ধান কাটা হয়ে গেছে। মাঠে লোকজন নেই। ঠিকই বলেছিল শরৎ এ বিভৎস-দৃশ্যটার কোন সাক্ষী নেই। স্টেশন ওখান থেকে মাঠভাঙা এড়োএড়ি পথে মাইলটাক হয় কি না হয়। কিন্তু ঐটুকু রাস্তার মধ্যেই বিপরীতগামী একজন পথচলতি মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। ভদ্রলোকই। ছাতা মাথায় আসছিলেন এদিক পানে। হাতে একটা র‍্যাশানের ব্যাগ। তাতে মালপত্র। বোধহয় শহর থেকে সওদা করে ফিরছেন। সত্যবান মুখটা তুলতে পারেননি। একটা প্রচণ্ড পাপবোধ যেন তাঁর ঘাড়টা ধরে মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি করে রেখেছে। কিন্তু কাছাকাছি এসেই ভদ্রলোক থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন : এ কি মশাই? এমন করে কেটে গেল কি করে?

এঁরাও দাঁড়িয়ে পড়েছেন। এতক্ষণে নজর হল—সত্যবানের ধুতির একটা অংশ লালে লাল হয়ে আছে। তখনও ভাল করে শুকিয়ে ওঠেনি। সত্যবান জবাব দিতে পারলেন না। গলার ভিতরটা কাঠ হয়ে গেছে। সনৎ কোনক্রমে বললে, না না, কাটেনি—ইয়ে, মানে···ও কিছু নয়··

ভদ্রলোককে স্তম্ভিত করে শ্বশুরের হাত ধরে প্রায় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায়।

স্টেশনে এসে টিউবওয়েলের জলে রক্তের দাগটা ধুয়ে ফেলার চেষ্টা হল ; কিন্তু রক্ত ততক্ষণে শুকিয়ে উঠেছে। এখানেও একটি দ্বিতীয় সাক্ষী রয়ে গেল। একটি রেল কর্মচারী, পয়েন্টস্ ম্যান বা ঐ জাতীয় কিছু—জল খেতে এসেছিল টিউকলে। সেও কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল, এৎনা খুন কৈসে নিকলা বাপুজী ?

এতক্ষণে একটা কৈফিয়ত খাড়া করেছে সনৎ। বললে, পিকনিক করতে এসেছিল। একটা পাঁঠা কাটতে গিয়ে বাবুজীর গায়ে ঐ রক্ত লেগেছে।

লোকটা ভ্রূকুঞ্চন করল। এক বৃদ্ধ এবং একজন জোয়ান উলুবেড়িয়া স্টেশনে এসে পিকনিক করতে পাঁঠা কেটেছে—এ তথ্যটা ঠিক হজম করতে পারল না। পিকিনিক পার্টির লোকজন সব কোথায় গেল ? নাকি ওরা দুজনেই একটা গোটা পাঁঠা কেটে খেতে চায় ?

ডাউন ট্রেন অল্পক্ষণ পরেই এল। ভেজা কাপড়ে সত্যবান উঠলেন। সনৎও উঠল গাড়িতে। সমস্ত পথে শ্বশুর-জামাইয়ে একটা কথাও হয়নি।

এই পর্যন্ত বিবৃত করে মাস্টারসা'ব নীরব হলেন। লছ্‌মনপ্রসাদ বলে, তব ক্যা হুয়া ?

ধীরে ধীরে মুখটা তুললেন সত্যবান। যুগল শ্রোতাকে একে একে দেখে নিলেন। তারপর বললেন, এর পর ঠিক কী কী ঘটেছিল তা আমার মনে নেই লছমন।

লছমন মৃদু ধমক দেয় : ইয়ে কৈসে হো সক্‌তা ? য়ু পজেস্ এ ফেনামেনাল মেমারি স্যার !

ঠিক কথা ! অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি প্যাবাবোলা স্যারের। বিশ বছর আগে যে ছেলে ওঁর ক্লাসে বসত তার রোল নম্বর কত তার হদিস পেলে উনি সাপের মন্ত্র আউরে বলে দিতে পারেন তার পিতৃদত্ত নামটা কী ! এমন দুর্লভ স্মৃতিশক্তি যে কোটিতে গুটিক দেখা

যায় না। কিন্তু মানুষেব মস্তিষ্কে স্নায়ুকেন্দ্রগুলিব বহস্য কি বিজ্ঞান আজও জানতে পেয়েছে? কোটি কোটি নার্ভ সেল কী ভাবে কাজ কবে? যে মানুষেব স্মবণশক্তি এমন বিস্ময়কব সে কেমন কবে ভুলে যায় জীবনেব এক একটা পর্যায়? এবং এমন একটি পর্যায় যা তাঁব জীবনেব মোড ঘুবিয়ে দিয়েছিল।

কিছু কিছু অবশ্য মনে আছে। দুর্ঘটনাব পব কয়েক মাস তিনি যেন একঘবে হয়ে বইলেন। লোকটি মাবা গেছে এ খবব ওঁব কানে এসেছিল, পুলিস কেস হচ্ছে তাও টেব পেয়েছিলেন। শুনেছিলেন, থানায় এফ আই আব —অর্থাৎ প্রথম এজাহাব দেয় টনি চক্রোত্তি মা বোন আব বোনাইয়েব দাদাকে নিয়ে ওবা দীঘা যাচ্ছিল। হ্যাঁ, বোনাইয়েব দাদা, যাব গাডি, সেই শবৎবাবুই গাডি চালাচ্ছিলেন। প্রাইমাবি স্কুল টীচাব হবিপদ দেবনাথ —মানে ঐ যে ভদ্রলোক দুর্ঘটনায় মাবা গেছেন, তিনি বেমক্কা বাস্তা পাব হতে গেলেন। বিপবীতগামী একটা ট্রাকে চালকেব দৃষ্টি রুদ্ধ হয়েছিল। দোষ পথচাবীরই। শবৎ দক্ষ ড্রাইভাব—প্রাণপণ ব্রেক কষে, তবু লোকটিকে বাঁচানো যায়নি। স্পীড? তা ঘণ্টায় পঁচিশ-ত্রিশ কিলোমিটাব হতে পাবে।

কেস উঠল কোর্টে থার্ড পার্টি ইন্সিওবেন্স ছিল। সেদিকে অসুবিধা নেই। কিন্তু পুলিসেব একটা সন্দেহ হল। এ কেমন কথা? নতুন বিয়ে হয়েছে অতসীব। তাব ভাশুবেব গাডি। অতসীব মা, দাদা আব ভাশুব দীঘা বেডাতে যাবে আব নতুন জামাই যাবে না? হিসাবেও যে দেখা যাচ্ছে নতুন জামাই সনৎ মুখার্জি তিনদিনেব ছুটি নিয়েছে। ওদিকে দীঘা সৈকতাবাসে তিনখানি ঘবও বুক করা হয়েছে সনৎ মুখার্জিব নামে। চাবজন মানুষেব জন্য তিনখানা ডবল্ বেডরুম? হিসাবটা মিলছে না কেন?

পুলিসের সমন পেল সনৎ মুখার্জি। 'ব্রীজ অ্যাণ্ড রুফ্' কোম্পানির সিবিল এঞ্জিনিয়ার। আদালতে হলপ নিয়ে সে এজাহার দিয়ে

এল। হ্যাঁ, সে ছুটি নিয়েছিল ঠিকই দীঘা যাবে বলে। তিনখানি ঘরও বুক করেছিল স্বনামে। কিন্তু ঘটনার দিন সকাল থেকে তার ঘন ঘন দাস্ত হতে থাকে। তাই শেষমুহূর্তে সে যাত্রা স্থগিত রাখে। নতুন জামাই অসুস্থ, তাকে একা ফেলে রেখে যাওয়া যায় না; তাই তার শ্বশুরমশাইও যাননি। কথা ছিল সনৎরা পরদিন যাবে একটু সামলে নিয়ে। বাড়িতে ছিলেন ওরা দুজন। ডাক্তার? না, ডাক্তার ডাকার মত অবস্থা হয়নি। সে এণ্টারকুইলন খেয়ে দেখছিল একদিন। অ্যালেবাই?…হ্যাঁ, সকালবেলা সে মিস্টার ভগৎরামকে একটা ফোন করেছিল।

ভগৎরাম বিশিষ্ট ব্যক্তি। সনতের 'বস'। ব্রিজ অ্যাণ্ড রুফের বড় অফিসার। তিনি মনে করতে পারলেন ঘটনার দিন সকালে মিস্টার সনৎ মুখার্জি ফোন করে জানিয়েছিল—অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে দীঘা যায়নি। ঠিক কটায়? তা হলপ নিয়ে বলা অসম্ভব। সকাল দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে হবে।

হাসপাতালে রুগী ভর্তি হয়েছিল সকাল আটটা পঞ্চাশে।

অথচ সনতের স্পষ্ট মনে আছে, সে যখন টেলিফোন করেছিল তখন রেডিওতে কণিকার গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে। অর্থাৎ সে-কথা সত্যি হলে তখন সকাল নটা দশ থেকে নটা কুড়ি।

এ সব বৃত্তান্ত সত্যবান কিছুই জানতেন না। তাঁকে জানানো হয়নি। সবাই স্থির করেছিল পণ্ডিত-মূর্খকে কিছু না জানানোই মঙ্গল। সত্যবানও জানতে চাননি—Where ingorance is bliss it is folly to be wise!—অজ্ঞানে অন্ধকারেই যেখানে শান্তি সেখানে জানতে চাওয়াই বিড়ম্বনা। কিন্তু জানতে হল তাঁকে। জানাতে বাধ্য হল ওরা। উপায় নেই। পুলিস ইন্সপেক্টর খুঁজে খুঁজে বার করেছে দু-দুজন সাক্ষী—যারা দেখেছে সনতের শ্বশুরকে রক্তরাঙা কাপড় পরে মাঠ পেরিয়ে পালাতে। কোর্ট পেয়াদা সমন ধরিয়ে দিল প্রাক্তন স্কুল-টীচার সত্যবান চক্রবর্তীকে।

শুরু হল তালিম। উকিলবাবু পাখিপড়া শেখাতে শুরু করলেন। মদত দিতে ছুটে এলেন দুই বেহাই—অতসী আর টনির শ্বশুর। ঘন ঘন আসতে থাকে শরৎ, সনৎ আর সমীর। সমীর তিন ভাইয়ের সব চেয়ে ছোট। 'ল' পড়ছে। তারই ব্যবস্থাপনায় উকিলবাবুর নিয়োগ। বস্তুত সমীর কদিনের জন্য বৌদির বাপের বাড়িতেই রয়ে গেল—সকাল-সন্ধ্যা ঐ বৃদ্ধকে তালিম দিতে। কী কী প্রশ্ন হতে পারে, কি ভাবে জেরায় ওপক্ষ তাঁকে বেকায়দায় ফেলতে পারে, কী কথার কী জবাব। চিরদিন ছাত্রদের শিখিয়েছেন—কোন্ প্রশ্নের জবাব কী ভাবে দিতে হয়—এখন ঐ যে অন্তরীক্ষের ম্যাথ্মেটিশিয়ান, যাঁর অঙ্কে নাকি কখনও ভুল হয় না, তিনি নিউটনের থার্ড ল অনুযায়ী যে কাঠায় মাপ সে কাঠায় শোধ করতে থাকেন। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন সত্যবান। নিয়তি তাঁকে এ কী কঠিন পরীক্ষায় ফেলল! জামাইয়ের বদলে তিনি জেলে গেলে হয় না?

সাবিত্রী ধমকে ওঠেন: তুমি কি বদ্ধ পাগল হয়ে গেলে?

বোধহয় তাই। হয়তো পাগলই হয়ে গেছেন বৃদ্ধ।

তারপরের কথা সত্যই মনে নেই তাঁর। কোন কোন ছাত্র তাঁকে বলেছে, বিশ্বাস করুন স্যার, 'হলে' গিয়ে সব গুলিয়ে গেল। একটা ফর্মুলাও মনে করতে পারলাম না! এটা কেমন করে হয় বুঝে উঠতে পারতেন না প্যারাবোলা-স্যার। অধীত বিদ্যা কখনও পরীক্ষার হলে আদ্যন্ত ভুলে যেতে পাবে মানুষ?

অথচ তাই হয়েছিল তাঁর নিজের ক্ষেত্রে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি কোন্ প্রশ্নের কী জবাব দিয়েছিলেন আজও মনে করতে পারেন না। এটুকু মনে আছে, কাঠগড়া থেকে নেমে এসে জনারণ্যের মধ্যে পরিচিত কাউকে আর খুঁজে পাননি। অথচ তাঁর স্পষ্ট মনে আছে আদালতে শরৎ ওঁকে যখন নিয়ে এসেছিল তখন গাড়িতে সবাই ছিল—শরৎ, সনৎ, সমীর, টনি, উকিলবাবু। কোথায় গেল তারা ওঁকে ফেলে? শরতের গাড়িটাও যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে

গাড়িটা নেই !

একাই ফিরে এসেছিলেন বাড়িতে। কিছুটা হেঁটে, কিছুটা বাসে।

উঃ! সে দিনগুলোর কথা মনে পড়লে এখনও বুকের ভিতর মুচড়ে ওঠে ! বাড়ির কুকুরটাকে লোকে যেভাবে খেতে দেয় সেভাবেই দু-বেলা তাঁর খাবারটা রেখে যেত বাড়ির ঝি। কেউ কথা বলত না তাঁর সঙ্গে। টনি না, সুষমা নয়, সাবিত্রী তো নয়ই।

তারপর রায় বার হল। শরতের হল জরিমানা, আর সনতের ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড। শরৎকে লঘু দণ্ড দিয়েছিলেন বিচারক —ভাইকে বাঁচাতে সে অপরাধ নিজের ঘাড়ে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু সনৎকে তিনি ক্ষমা করেননি। নিজ অপরাধ গোপন করতে সে হলপ নিয়ে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। তাই শুধু জরিমানা করেই ক্ষান্ত হননি বিচারক —সশ্রম কারাদণ্ড বিধান করলেন তার।

আদালতের রায় যেদিন বার হল, মাজায় দড়ি বেঁধে নতুন জামাইকে নিয়ে গেল কারাগারে, সেদিনই রায় দিলেন সাবিত্রী : ঐ মানুষ-টার সঙ্গে এক ছাদের নিচে থাকতে পারবেন না। মাথা নীচু করে বেরিয়ে এসেছিলেন সত্যবান। প্রায়শ্চিত্ত করতে।

দীর্ঘ কাহিনী শেষ করে সত্যবান থামলেন।

রত্না প্রশ্ন করে, এই পাঁচ বছরে ওদের সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি ? ওরা কোন চিঠিপত্র লেখেনি ? কিংবা টাকা পয়সা···

মুখটা তুললেন প্যারাবোলা-স্যার। বললেন, না চিঠিপত্র লেখেনি ; কিন্তু যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল ঘটনাচক্রে। সনৎ ছাড়া পাওয়ার আগেই একবার ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গিয়েছিল অতসীর সঙ্গে। দশাশ্বমেধ ঘাটে। সেই সন্ধ্যাটি—

মাঝপথেই থেমে পড়েন। তারপর হেসে বলেন, থাক। সে সব কথা শুনে তোমাদের কাজ নেই।

: কেঁও ? ক্যা বাত ? জানতে চায় লছমনপ্রসাদ।

: শুধু শুধু কষ্ট পাবে। সে সব অপমানের কথা আমিও ভুলে

থাকতে চাই।

রত্না সায় দেয় : তব্‌ রাহ্‌নে দিজিয়ে।

কিন্তু রাজী হয় না লছমনপ্রসাদ। তার ভাষায় বলে, মাস্টার-সা'ব, আপনি শর্ত করিয়ে নিয়েছেন আমার অর্থসাহায্য নেবেন না; কিন্তু তাই বলে ছেড়ে কথা বলবার মানুষ এই লছমনপ্রসাদ নয়। যারা আপনার মত মানুষকে অপমান করে তাদের ক্ষমা করা পাপ! আপনি বলুন?

'তুমি কী করবে? তুমি কেন নিজেকে জড়াচ্ছ এর ভেতর?

: সে সব আপনার শুনে কাজ নেই। সে আপনি বুঝবেনও না। কিন্তু এর পর যদি -'আমার কোন দায়িত্ব নেই' বলে ফিরে যাই তাহলে আমি নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না। আগেই তো বলেছি স্যার--সন্তান আপনার ছড়িয়ে আছে সারা ভারতবর্ষে — আমার অর্থসাহায্য নেব না বলে ইতিপূর্বেই আপনি আমাকে অপমান করেছেন। আর করবেন না—

: অপমান! তোমাকে আমি অপমান করেছি লছমন?

: জী হাঁ! কিন্তু যাক সে কথা। বলুন আমাকে, দশাশ্বমেধঘাটে কী ঘটেছিল?

বাধ্য হয়ে আবার মেলে ধরেন সেই বেদনার্দ্র ইতিহাস :

কাশী-প্রবাসের একেবারে প্রথম যুগের কথা। একদিন সন্ধ্যায় বসেছিলেন দশাশ্বমেধঘাটে। সামনে দিয়ে বহে যাচ্ছে পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী। গঙ্গাবক্ষে নৌকোর সারি। রামনগরের দিকে একটু আগে অস্ত গিয়েছে দিনান্তের সূর্য। প্রদোষঅন্ধকারে আকাশে ফুটে উঠছে একটি দুটি তারা। পিছনে কোন মন্দিরে শুরু হল সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি। সামনে গোল পাতার ছায়ায় কথকতা হচ্ছে, ভাগবত পাঠ হচ্ছে। উনি বসেছিলেন পাষাণ রানায়। একা, উদাসীন, অন্য-মনা। একটি নৌকো এসে ভিড়ল ঘাটে। কয়েকজন যাত্রী, বাঙালীই

হবেন, নেমে এলেন নৌকো থেকে। একজন বৃদ্ধ, একটি তরুণ এবং একটি তরুণী। বৃদ্ধের হাতে লাঠি, পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, ছেলেটি পরেছে চোঙা প্যাণ্ট, মেয়েটি একটি মুর্শিদাবাদী সিল্ক। হঠাৎ চমকে উঠলেন সত্যবান। মুহূর্তে মুছে গেল অতীত বর্তমান! দশাশ্বমেধ-ঘাটের দৃশ্যাবলি মুছে গেল নিঃশেষে। গঙ্গা নেই, মন্দিরের শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনিস্তব্ধ,—শুধু চোখের উপব ভাসছে নতনয়না এক হতভাগিনী যুবতীব মূর্তি। অতসী! দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটে এলেন বৃদ্ধ। ঐ আত্মজার কাছেই যে সবচেয়ে বড় অপরাধী হয়ে আছেন। সদ্য বিবাহিত কন্যাকে বঞ্চিত করেছেন স্বামীসুখ থেকে—তার কপালে লেপে দিয়েছেন অনপনেয় কলঙ্ককালিমা! স্বামী যার জেল খাটছে—রাজনৈতিক কারণে নয়, সাধারণ কয়েদী হিসাবে, তাব বুকে যে হিমালয়ান্তিক বেদনাব ভার! তাই বোধহয় ওর শ্বশুব আর দেওর ওকে সবিয়ে নিয়ে এসেছে পরিচিত পরিবেশ থেকে।

ছুটে এসে চেপে ধরলেন অতসীর হাত। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে আঁচলে মুখ ঢাকল অতসী, ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। অনেকেই লক্ষ্য করেছে নাটকীয় দৃশ্যটা। সমীর কয়েক ধাপ নিচে ছিল, মাঝিকে কড়ি গুনে দিচ্ছিল—কিন্তু ঘটনাটা তার নজব এড়ায়নি। সে অকুস্থলে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই বৈবাহিক তাঁর পুত্রবধূব হাতটা জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে পাষাণ রানার ধাপ বেয়ে উঠে গেলেন উপরে। প্রায় ছুটতে শুরু করলেন রিক্সার দিকে। অতসী তখনও আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। দু-একজন কৌতূহলী হয়ে সত্যবানের কাছে এগিয়েও এসেছে ব্যাপারটা কী তা জানতে।

ঠিক তখনই অকুস্থলে সমীরের নাটকীয় প্রবেশ। পুঞ্জীভূত ক্রোধ তার জমা হয়ে আছে বহুদিন। এমন সুযোগ সে ছাড়ল না। ভীড় সরিয়ে এগিয়ে এল সে। বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল বৃদ্ধের ফতুয়ার সামনের দিকটা। বললে, বল, হারামজাদা! কেন আমার বৌদির হাত চেপে ধরেছিলি?

সত্যবান বজ্রাহত। কথা ফুটল না তাঁর মুখে।

ঠাস করে একটা চড় মারল সমীর। টলে উঠলেন সত্যবান।

: হারামজাদা! তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে তবু রস মরেনি? বল্ কেন মেয়েছেলের গায়ে হাত দিয়েছিলি?—এবার প্রচণ্ড লাথি মারে বৃদ্ধের তলপেটে।

বসে পড়লেন সত্যবান। অনশনক্লিষ্ট দুর্বল শরীর। কিন্তু যন্ত্রণাটা দৈহিক নয়, ওঁর অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠল সমীরের অশ্লীল অভিযোগে। ঘাটসুদ্ধ লোকের সামনে কামুক বৃদ্ধের এ লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করতে চাইলেন তিনি, অস্ফুটে বললেন, কী বলছ বাবা? ও যে,···ও যে···

অনেক-অনেক দিনের রাগ পুষে রেখেছে সমীর। চুটিয়ে হাতের সুখ করে নেবার এ সুযোগ সে ছাড়ল না। এবার বসিয়ে দিল একটা ঘুষি ওর নাকে: শালাহ্! এতক্ষণে বাবা বলছে!

দু-একজন বাধা দিতে এগিয়ে এল: থাক থাক। যথেষ্ট হয়েছে। বুড়ো মানুষ···

যারা প্রথম থেকে দেখছিল তাদের মধ্যে একজন বলে ওঠে: যথেষ্ট হয়নি মশাই। এদের জন্যই কাশীর বদনাম। শালা বুড়ো ভাম। আমি স্বচক্ষে দেখেছি···

অসহায়ভাবে জনতার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন প্যাবাবোলা-স্যার। নাক দিয়ে তখন দরদর করে রক্ত ঝরছে। কথা বলতে গেলেন—কী বলতেন তা জানেন না, কিন্তু বলতে পারলেন না। শুরু হয়ে গেল এবার চাঁদা করে মার। লুটিয়ে পড়ল তাঁর রক্তাক্ত দেহটা দশাশ্বমেধ ঘাটের পাষাণ চত্বরে!

অচেতন মানুষকে ঠেঙিয়ে হাতের সুখ হয় না। প্রতিটি আঘাতে কেঁপে কেঁপে উঠবে, যন্ত্রণায় মুখটা বেঁকে যাবে, লুটিয়ে পড়বে পায়ের উপর—তবেই না মারের মজা! তাছাড়া বুড়োটা মরে গিয়ে থাকলে পুলিসের ঝামেলা হতে পারে। জলে-কাদায় মাখামাখি হয়ে বুড়োটা

যখন নিথর হয়ে গেল তখন সমাজ-সংস্কারকদল মানে মানে বিদায় হলেন।

বৃদ্ধের যখন জ্ঞান হল তখন ঘাট নির্জন। জেগে আছে শুধু গঙ্গাস্রোত আর মিটমিটিয়ে ওকে দেখছে এক আকাশ তারা। দক্ষিণ আকাশে দেখা দিয়েছে বৃশ্চিকরাশি। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের চোখ প্যারা-বোলা-স্যারের মতই ঘোলাটে লাল। সর্বাঙ্গে বেদনা। ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে হামগুড়ি দিয়ে নেমে গেলেন শেষ ধাপে। আঁচলা ভরে গঙ্গার জল পান করলেন।

কামুক বৃদ্ধের ব্যভিচারে মা-গঙ্গা মুখ ফেরাননি। সমস্ত শরীর জুড়িয়ে গেল।

দ্বৈরথ-সমরে কিন্তু দ্রোণাচার্যকেই হারতে হল। বৃদ্ধ কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না, লছমনও নাছোড়বান্দা। বলে, তার নাকি কলকাতায় কি কাজ আছে! কাশী থেকে সস্ত্রীক কলকাতাতেই তার যাবার কথা। মাস্টারসা'বকে সে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। সে জানতে চায়—কেন সাবিত্রী এতদিন সাড়া দেননি। আসলে লছমনের উদ্দেশ্য অন্য রকম; কিন্তু কথাটা সে ভেঙে বলেনি তার মাস্টারসা'বকে। ও একহাত লড়তে চায়। ও দেখতে চায় টনি চক্কোত্তির দৌড়টা। লছমন কৈশোরকালে বক্সিং লড়ত—মার খেয়ে হজম করে যাওয়াটা তার ধাতে নেই। কর্মজীবনেও তার বক্সিংএ বিরাম নেই। পুলিসে কাজ করে লছমনপ্রসাদ তেওয়ারি। সেণ্ট্রাল পুলিসে।

বৃদ্ধ আপত্তি করেছিলেন কলকাতায় ফেরার প্রস্তাবে। বলেছিলেন, সাবি শুধু শুধু লজ্জায় পড়বে। কলকাতায় অভ্যস্ত জীবনে ফিরে এসে সে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল তার ভুলটা।

রত্না বলেছিল, কিন্তু বাড়ি তো আপনার। আপনি তো বেঁচে আছেন, আপনি তো ইচ্ছে করলে···

বাধা দিয়ে সত্যবান বলেন, সেইটেই তো সমস্যা রত্না। আমি বেঁচে আছি, কিন্তু আমার ইচ্ছেটা মরে গেছে!···তুমি বুঝবে না রত্না, লছমন বুঝবে···অনেক সময় 'আন্‌নোন' ফ্যাক্টারকে এলিমিনেট না করলে অঙ্ক মেলে না। আমি ওদের সংসারের ইকোয়েশানে ছিলাম একটা অবাঞ্ছনীয় ফ্যাক্টার। গুণ-ভাগ-ক্রশ-মাল্‌টিপ্লাই যেমন করে হোক আমাকে হঠানোর দরকার হয়ে পড়েছিল ওদের।

সনতের অ্যাক্সিডেন্ট ইজ জাস্ট্ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট—ওটা না ঘটলে অন্য কোন ছুতো খুঁজে বার করত ওরা—

: কেন? আপনি তো নির্বিরোধী মানুষ। আপনি থাকায় কী ক্ষতি হচ্ছিল ওদের?

: বুঝলে না? শোন, বুঝিয়ে বলি। আমি আর সাবি ছিলাম বেস্-এর (ভূমির) দুটি বিন্দু, আর নিউটন ছিল ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু। এই ছিল আমাদের সংসারের ফরমেশন -নিটোল একটি ইকুই-ল্যাটারাল (সমবাহু) ট্রায়াঙ্গেল। মানে যতদিন ওর বিয়ে হয়নি। তারপর এল বৌমা। আমরা অ্যাড্জাস্ট করতে পারলাম না। দোষ কার তা বলা কঠিন, বোধ করি দোষ কারও নয়--এটা অঙ্কশাস্ত্র মতে অসম্ভব, তাই!

রত্না বলে, কী অসম্ভব অঙ্কশাস্ত্র মতে?

ছেলে

বাপ
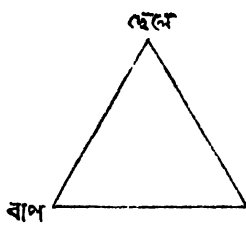
: ফোর পয়েন্টস্ ইকুইডিস্টান্ট ফ্রম ওয়ান অ্যানাদার! সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি বিন্দু থাকে পরস্পর থেকে সমদূরত্বে। মা থেকে ছেলে=ছেলে থেকে বাপ=বাপ থেকে মা। এখানে পুত্রবধূকে কি করে অ্যাড্জাস্ট করবে? চারটি বিন্দু কিছুতেই পরস্পরের কাছ থেকে সমদূরত্বে অবস্থান করতে পারে না।

রত্না তর্কের খাতিরে বলে, কেন? বর্গক্ষেত্র? স্কোয়্যার? সেখানেও তো চারটি বিন্দু পরস্পরের সমদূরত্বে সহাবস্থান করে! করে না?

কদমফুল মাথাটা নেড়ে প্যারাবোলা স্যার বললেন, না! করে না! পিতা-মাতা-পুত্র-পুত্রবধূকে কিছুতেই এভাবে সাজাতে পারবে না যাতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে সমদূরত্বে থাকবে! তা হয় না! ইট্স্ এ জিওমেট্রিক্যাল অ্যাবসার্ডিটি! ডায়াগোনাল অর্থাৎ কর্ণের দৈর্ঘ্য সবসময় বাহুর চেয়ে বড় হবে।

রত্না বলে, বুঝলাম না।

বৃদ্ধ এঁটো হাতেই গল্প করছিলেন। উৎসাহিত হয়ে পড়েন ছাত্রীর প্রশ্নে। এঁটো থালায় হাত বুলিয়ে দাগ দিতে থাকেন: এই মনে কর আমি, এই সাবি, এই নিউটন আর এই বৌমা। এখন আমার থেকে বৌমার দূরত্ব সাবি বা ছোটখোকার চেয়ে বেশি। কত বেশি? বৌমার দূরত্ব ইজুক্যালটু রুট-ওভার ছোট-খোকার দূরত্ব-স্কোয়ার প্লাস সাবির দূরত্ব-স্কোয়ার! ফলো?
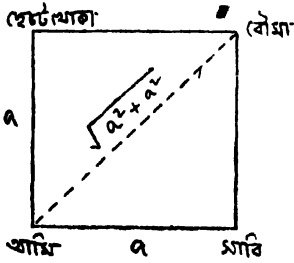
রত্নার ততক্ষণে বাক্যি হরে গেছে! কিন্তু অর্জুন হার মানেনি।

সে জানে, মাস্টারসা'বকে রাজী করাতে হলে অঙ্কের রণক্ষেত্রে তাঁকে পরাজিত করতে হবে। অঙ্ক দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে—তাঁর ভুলটা। বললে, স্যার, আমি মানতে পারছি না।

কেন মানতে পারছ না লছমন? কোথায় আমার ভুল?

আপনি টু ডাইমেনসনে অঙ্কটাকে দেখছেন। আপনার সল্যুশান বর্গক্ষেত্র নয়, রেগুলার টেট্রাহেড্রন! জীবনটা প্লেন—জিওমেট্রির নয়, এ সংসার ত্রিমাত্রিক!
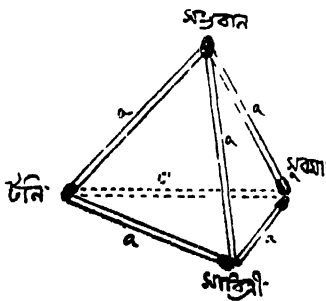
ছটা দেশলাই কাঠি দিয়ে সে রত্নাকে বুঝিয়ে দিল।

হার স্বীকার করলেন দ্রোণাচার্য! এঁটো হাতেই খপ করে চেপে ধরলেন অর্জুনের হাতটা: য়ু আর পারফেক্টলি রাইট, মাই বয়!

ট্রেনের কামরায় প্রশ্নটা তুলল রত্না। বস্তুত বহুদিন পূর্বে এ নিয়ে

রীতিমত গবেগষণা করেছিল ওর স্বামী। সমস্যাটার সমাধান হয়নি। সত্যবান চক্রবর্তী কেমন করে 'প্যারাবোলা স্যার' হয়ে গেলেন। স্কুলের ছেলেরা, প্রাক্তন ছেলেরা এমনকি মাস্টার মশাইরা পর্যন্ত সে খবর রাখতেন না। অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু প্যারাবোলা স্যার প্রশ্নটা বারে বারে এড়িয়ে গেছেন। কিষেণগড়ে তাঁর ঐ নামটা প্রথম চালু করেছিলেন বাবু-সাহেব—সিনিয়ার বাবু-সাহেব। তিনিও জানতেন না ঐ নামের ব্যুৎপত্তিগত অথবা উৎপত্তিগত ইতিহাস। তিনি নাকি নামটা শুনেছিলেন কলকাতার এ. বি. টি. এ. অফিসে। সে আমলের অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনে সত্যবান চক্রবর্তীর নাম ছিল 'প্যারাবোলা স্যার।

বত্রা বললে, মাস্টার সা'ব অব বাতায়ে আপ কৈসে প্যারা-বোলা স্যার হো গয়া?

বৃদ্ধ হাসলেন। বলেন, ও কিছু নয়। ছেলেদের দুষ্টামি।

দুষ্টামি তো বটেই। কিন্তু ইলিপ্স নয়, সার্কেল নয়, হঠাৎ প্যারাবোলা কেন? সেদিন আপনি ওকে বলেছিলেন—এটাই আপনার সত্য পরিচয়। আপনি বলুন? আমাদের ভীষণ কৌতূহল!

লছমন ডিটো দেয়: প্লীজ স্যার!

মনটা খুশী ছিল। দীর্ঘদিন পরে কলকাতা ফিরছেন। ছোট-খোকা, বৌমা, সাবি—অমৃত ব্যানার্জী রোডের চিলেকোঠার ঘরে সেই আলমারি-ভর্তি অঙ্কের বইগুলো! বৃদ্ধ বলেন, শুনবি সে কথা? আচ্ছা শোন্ বলি। এ একেবারে আমার চাকরি জীবনের গোড়ার দিকে। তখন আমি ভবতারণ এইচ. ই. স্কুলের থার্ড মাস্টার।

সেদিন তিন-তিনজন মাস্টার অনুপস্থিত। ফার্স্ট পিরিয়ডটা অফ্ ছিল সত্যবানের; কিন্তু ঠিক দশটায় হাজিরা দিয়েছেন তিনি। ক্লাস থাক না থাক দশটাতেই উনি স্কুলে আসেন। টিচার্স-রুমে গিয়ে বসেছেন কি বসেননি হেড স্যার সেলাম দিলেন দারোয়ান মারফত। হেড-স্যারের ঘরে ঢুকতেই তিনি বলেন, আপনার তো এখন

ক্লাস নেই? আপনি বরং 'ক্লাস-টেন'-এ গিয়ে সুশীলবাবুর ক্লাসটা ঠেকা দিন।

সুশীলবাবু ইংরাজী পড়ান। সত্যবান অঙ্ক। মাঝে-মধ্যে বাংলা, বা ইতিহাসের ক্লাস নিতে হয়েছে; কিন্তু ইংরাজীটাকে উনি পারত-পক্ষে এড়িয়ে চলেন। সেটা জানা ছিল হেডমাস্টার মশায়ের; তাই তিনি পাদপূরণ করেন: চল্লিশ মিনিট ছেলেদের আটকে রাখুন আর কি, নাহলে পাশের ক্লাস করা যাবে না। অঙ্ক-টঙ্কই কষান বরং।

সত্যবান স্বীকৃত হয়ে যথারীতি 'ক্লাস টেন'-এ সেকশনের দিকে এগিয়ে যান। ক্লাসে পদার্পণের পূর্বেই যথারীতি শোনা গেল—সিডাউন, সিডাউন বয়েজ! নাউ টেক ডাউন···

কিন্তু বোর্ডের দিকে যাওয়া হল না। সামনের বেঞ্চে বসেছিল শচীনন্দন লাহিড়ী ক্লাসের ফার্স্ট বয়। অঙ্কে দারুণ মাথা। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, মাপ করবেন স্যার, এটা ইংরাজী পোয়েট্রির ক্লাস।

সত্যবান ঘুরে দাঁড়ালেন। বলেন, তাতে কি? ইংরাজীর বদলে অঙ্ক কষলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

শচীনন্দন বললে, ইংরাজীর সিলেবাস অনেক—অনেক বাকি আছে স্যার। তাই···মানে···

সত্যবান দ্বিধায় পড়লেন। ঠিক কথা। ছেলেদের সামনে ম্যাট্রিক। সিলেবাস শেষ হওয়া দরকার। শুধু অঙ্কে বেশি নম্বর পেলেই ওরা পাস করবে না। জানতে চাইলেন সুশীলবাবু কী পড়াচ্ছিলেন। ওরা বললে, শেলীর 'স্কাইলার্ক'।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন। ঘটনাচক্রে এটি সত্যবান চক্রবর্তীর ভালভাবে পড়া ছিল। তিনি যেবার ম্যাট্রিক দেন সেবারও ওটা ছিল সিলেবাসে। তৎক্ষণাৎ পড়াতে শুরু করে দিলেন তিনি।

ছেলেরা অবাক হয়ে গেল সত্যবান স্যারের জ্ঞানের গভীরতা দেখে। কাব্যপাঠ শেষ করে সত্যবান সমগ্র কবিতাটির একটি 'ক্রিটি-কাল অ্যাপ্রিসিয়েশন' করতে চাইলেন—কাব্যিক মূল্যায়ন। প্রসঙ্গত

উল্লেখ করলেন সমসাময়িক কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতাটি। স্কাইলার্ক বা ভরতপক্ষীর উপর দুই দিকপাল কবি দুটি ছোট কবিতা লিখেছেন। তাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক আলোচনা করতে থাকেন। একই বিষয়বস্তু—ভোরের আকাশে উদয়সূর্যের আবির্ভাবে ভরতপক্ষী শিষ দিতে দিতে সোজা উঠে যাচ্ছে মাটি থেকে আকাশে। শেলীর চোখে সে একটা দেহাতীত আত্মা—একটা অপার্থিব আনন্দের ব্যঞ্জনা, যাকে চোখে দেখা যাচ্ছে না, শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়ে তার স্বর্গীয় আনন্দ-নন্দন ধরা দেয়! সে যেন জোনাকির আলো, বিরহীর সঙ্গীতমূর্ছনা, পাণ্ডুর চাঁদের ম্লানিমা! শেলী রক্তমাংসে গড়া স্কাইলার্ককে অস্বীকার করেছেন—সে যেন বিদেশী আনন্দরস। অপরপক্ষে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলছেন—না! আনন্দের অভিসারী ভরতপক্ষী পার্থিব বন্ধনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারে না! পৃথিবী থেকে উৎক্ষিপ্ত কোন বস্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করতে পারে না, অধিবৃত্তের অনিবার্য পথপরিক্রমা তার নিয়তি। সত্যবান বললেন, ভরতপক্ষী একটা রূপক —শেলী এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁদের স্ব-স্ব কবিসত্তার কথাই বলতে চেয়েছেন ঐ দুটি সমনামী গীতিকবিতায়। তবু নামকরণে সামান্য পার্থক্য আছে। শেলীর দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চই আনন্দঘন—তাই তাঁর ভরতপক্ষী কোন বিশেষ নয়, তাঁর কবিতাটির নাম To a Skylark। অপরপক্ষে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাছে ঐ বিশেষ ভরতপক্ষীটি অন্তরদর্পণে তাঁর নিজ কবিসত্তারই প্রতিচ্ছায়া ; তাই তাঁর কবিতার নাম To the Skylark!

সত্যবান-স্যার থামলেন। ম্যাট্রিক-ক্লাসের ছাত্রের পক্ষে ব্যাখ্যাটা একটু শক্ত হয়েছে। ওদের সিলেবাসে শুধু শেলীর ভরতপক্ষীই আছে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পাখীটি না-পাত্তা। ফার্স্ট বয় শচীনন্দন ছাত্রদের মুখপাত্র হিসাবে বললে, বুঝলাম না স্যার। আর একটু বুঝিয়ে বলুন।

এবং তখনই, ভারসাম্য হারালেন সত্যবান। ভুলে গেলেন, তিনি

আজ ইংরাজীর শিক্ষক। প্রিয়তম ছাত্র শচীনন্দনের দিকে ফিরে বললেন, বুঝলি না? এই ছাখ্‌!

চকটা তুলে নিয়ে বোর্ডে চলে গেলেন। পাশাপাশি টানলেন ছুটি চিত্র। একটি সরল রেখা, খাড়া তাল গাছের মত দাঁড়িয়ে; দ্বিতীয়টি প্যারাবোলা : পাথ্‌ অব এ প্রজেক্টাইল!

বললেন, ঐই খাড়া লাইনটা হচ্ছে শেলীর স্কাইলার্ক। সে বন্ধন-মুক্ত। ডাইনে বাঁয়ে তাকায় না। মাটি থেকে খাড়া উঠে যায়, জেনিথের দিকে। আর ওয়াডস্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্ক হচ্ছে প্যারাবোলা! প্যারাবোলার ধর্ম কী? তাকে ছুদিকে সমান নজর রাখতে হয়। প্রতিটি বিন্দুতে ফোকস্‌ থেকে তার যা দূরত্ব ডিরেক্‌ট্রিক্স থেকে ঠিক

ততটাই দূরত্ব। তাই নয়? এখানে ডিরেকট্রিক্স হচ্ছে কবির ভূমা-নন্দ আর ফোকস্‌ হচ্ছে তার সংসার, তার প্রিয়জন। The locus of the path of the skylark is a parabola, the path of a projectile: "True to the kindred points of heaven and home!" Heaven is directrix and home is focus. Follow?

নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি হল। না, এ বিচিত্র ব্যাখ্যা শুনে শেলী-ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ স্বর্গের গীর্জায় ঘণ্টাধ্বনি করেন নি। পিরিয়ড শেষ হওয়ায় দরোয়ান ধাতব নিনাদ তুলেছিল মাত্র। সত্যবান-স্যার না পেলেও ছাত্ররা অব্যাহতি পেল।

সত্যবান-স্যারকেও খালি হাতে ফিরতে হয়নি।

পরদিন থেকে তাঁর নতুন খেতাব হল : প্যারাবোলা স্যার।

ট্যাক্সিটা যখন অমৃত ব্যানার্জী রোডের সামনে এসে দাঁড়ালো তখন সকাল আটটা। লছমন বললে, মাস্টার-সাব, আপ্ ইহা ঠাহ্-রিয়ে। ম্যয় পহিলে উন্‌সে মিলনে চাহ্‌তা —

মরমে মরে ট্যাক্সির গদে অন্যদিকে ফিরে নিশ্চুপ বসে রইলেন সত্যবান। বল্লা বললে, ঠিক হ্যয়, তুম যাও পহিলে

কলিং-বেল বাজাতে যে মহিলাটি দরজা খুলে দিলেন তার পরি-ধানে একটি হাউস-কোট। আগন্তুককে আপাদমস্তক দেখে নিলেন। সেলস্‌ম্যান, না উমেদার? কিংবা এমনও হতে পারে পার্চেস অফিসার টনি চক্কোত্তিকে এ লোকটা 'প্রাইভেটে' মিট করতে চায়। তাই সুরমার দৃষ্টিতে এখনও না আবাহন, না বিসর্জন : ইয়াস?

— মিস্টার টনি চক্রবর্তী আছেন?

— আছেন। কোথা থেকে আসছেন আপনি?

— সেটা একটু প্রাইভেট কথা! ওকেই বলতে চাই—

উৎফুল্ল হয়ে ওঠে মনে মনে। অনেকদিন এমন 'প্রাইভেট-কথা' শোনাতে পার্চেস-অফিসার টনি চক্কোত্তির গৃহে সেলিং-এজেন্টদের শুভাগমন ঘটছে না। লোকটার হাতে কোন প্যাকেট-ট্যাকেট নেই— কিন্তু ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে। ভাবি কিছু মালও হতে পারে। সুরমা ওকে যত্ন করে বসায়। ফ্যানটা খুলে দেয়। বলে, বসুন, উনি আসছেন ··

যে দ্বার দিয়ে নায়িকার প্রস্থান সেই দ্বার দিয়েই নায়কের প্রবেশ। ড্রেসিং গাউনের ফাঁস লাগাতে লাগাতে এগিয়ে এলো টনি চক্কোত্তি। পরিচিত কোনও সেল্‌স্ রিপ্রেজেন্টেটিভ নয় : ইয়েস! হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়ু?

লছমন হিন্দীতে বললে, আপনার মা কোথায়?

আগন্তুককে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে টনি বললে, কেন

বলুন তো? কী দরকার?

: দরকারটা আমার নয়। আপনার বাবার। তিনি ট্যাক্সিতে বসে আছেন।

কঠিন হয়ে গেল টনি! জানলা দিয়ে অপেক্ষমান ট্যাক্সিটাকে এক নজর দেখে নিয়ে বললে, আপনার পরিচয়?

: আপনার বাবার ছাত্র।

এক মুহূর্ত ভেবে নিল টনি। তারপর বললে, আপনি ভুল করেছেন। এ বাড়িতে ওঁর ঠাঁই হবে না।

লছমন বললে, আমি যতদূর জানি—বাড়ির মালিক মিস্টার সত্যবান চক্রবর্তী। নিজের বাড়িতে তাঁর ঠাঁই হবে না কেন, তার কারণটা জানতে পারি?

: নো! য়ু মে নট!—টনি আগন্তুককে এখনও বসতে বলেনি। নিজেও দাঁড়িয়ে আছে। বললে, বাড়ি আমার অধিকারে আছে। আপনার মাস্টার-মশাইকে থানায় যেতে বলবেন।

এতক্ষণে জুৎ করে বসল লছমন প্রসাদ। পকেট থেকে সুদৃশ্য সিগারেট-কেস বার করতে করতে বললে, বসুন। অনেক কথা আছে।

টনি রুখে ওঠে, না! কথা কিছু নেই। আপনিই বরং উঠুন—

লছমন সিগারেটটা ধরালো। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, মিস্টার চক্রবর্তী, আমার একটা পরিচয়ই শুনেছেন, আরও কিছু পরিচয় আছে আমার, সেটুকুও শুনুন। তারপর না হয় স্থির করা যাবে, আমি বসব, না যাব।—পকেট থেকে এবার ওয়ালেটটা বার করে। ভাঁজ খুলে তার আইডেন্টিটি-কার্ডটা দেখায়। বলে, আমি আছি সেন্ট্রাল ভিজিলেন্সে! নাউ সিট ডাউন!

টনি থতমত খেয়ে যায়। বসে পড়ে! সামলে নিয়ে বলে, আপনি কোথায় চাকরি করেন তা জানবার বিন্দুমাত্র কৌতূহল আমার নেই—

: আজ নেই। সাতদিন পরে হবে। যেদিন আপনার ফাইলটা নিয়ে তদন্তে আসব—

হাসল লছমন। অমায়িক হাসি। হাসি কিন্তু আবশ্যিকভাবে সংক্রামক নয়।

: দ্বিতায় কথা। আপনার ভগ্নীপতি মিস্টার সনৎ মুখার্জির বিষয়েও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। ব্রিজ অ্যাণ্ড রুফের চাকরি যাওয়ার পর তিনি সি. এম. ডি. এ-তে ঢুকেছেন। সরকারী গেজেটেড অফিসার। জানেন নিশ্চয়—পি. এস. সি.-র সিলেকশনের পর পুলিস ভেরিফিকেশন হয়। অনুসন্ধান করে দেখেছি, পুলিস রিপোর্টে উল্লেখ নেই তিনি কনভিক্‌টেড আসামী—সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। এটাই আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন : আপনি কি প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জানেন—এ বাবদে আপনার ভগ্নীপতি কী পরিমাণ খরচ করেছেন?

কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় টনি চক্কোত্তির। সে স্বপ্নেও ভাবেনি, ছুঁদে পুলিস অফিসার লছমন বানিয়ে বানিয়ে একটা মিথ্যার পাহাড় রচনা করছে। কোনক্রমে কী একটা উত্তর দেবার উপক্রম করতেই লছমন বাধা দিল : নো-নো-নো! বেফাঁস কিছু বলে বসবেন না! আমি আজ ফর্মালি আপনার কাছে আসিনি, টেপ-রেকর্ডারও আনিনি। তাছাড়া উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না করে বেফাঁস কিছু বলে আপনি বিপদগ্রস্ত হন এটাও আমি চাই না। আফটার অল, আপনার বাবা আমার মাস্টার-মশাই। আপাতত যান, আপনার বাবাকে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে আনুন।

কাঠের পুতুলের মত বসে থাকত টনি, জেদী বুনো ঘোড়ার ভঙ্গীতে।

লছমন জানে—কোথায় কতটা সুতো ছাড়তে হয়। সে পীড়াপীড়ি করে না। নিজেই উঠে যায়, বৃদ্ধকে নামিয়ে আনতে। বৈঠকখানার সোফায় তাঁকে বসিয়ে দিয়ে বললে, মাস্টার-সাব, এ আপনার নিজের বাড়ি। টনি চক্কোত্তি, তার স্ত্রী-পুত্র এ বাড়িতে

থাকবে কি থাকবে না সেটা নির্ভর করবে আপনার মর্জির উপর। ওরা যে ব্যবহার করেছে, তাতে আমি হলে ওদের ঘাড় ধরে বার করে দিতাম। কিন্তু আপনাকে তো চিনি। আপনি নিশ্চয়ই ওদের ক্ষমা করবেন! তাই করুন, আমি আপত্তি করব না। সাতদিন পরে এসে জেনে যাব আপনার সিদ্ধান্তটা। আমার ঠিকানাটা রাখুন। ইতিমধ্যে মিস্টার টনি চক্কোত্তি, অথবা ঐ যে ভদ্রমহিলা পর্দার ওপারে দাঁড়িয়ে সব শুনছেন, ওঁরা কোনও অসুবিধা সৃষ্টি করলে পাবলিক টেলিফোনে গিয়ে স্রেফ আমাকে একটা ফোন করে দেবেন।

একটা নামাঙ্কিত কার্ড সে রাখল বৃদ্ধের সম্মুখে টিপয়ের উপর।

বৃদ্ধের সেদিকে নজর নেই। তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন দেওয়ালে টাঙানো একটি বাঁধানো ফটোর দিকে। লছমনের একটি কথাও কানে যায়নি তাঁর।

মাস্টার-সাবকে প্রণাম করে দ্বারের দিকে এগিয়ে গেল লছমন। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। টনিকে বললে, আপনি নিশ্চয় চাইছেন না যে, সাতদিন পরে আমি আবার আসি। কিন্তু আসতে আমাকে হবেই। আপনার কেসটা পারস্যু করব কি করব না সেটা পরের কথা, আপাতত আমার পরামর্শ—ইতিমধ্যে আপনারা নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবেন। থ্যাঙ্কু!

লছমন কখন বেরিয়ে গেছে জানতেও পারেননি প্যারাবোলা-স্যার। তিনি তখনও দেখছিলেন সেই এনলার্জড ফটোখানা। একদৃষ্টে। ফটোর মহিলাটিও একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন দর্শকের দিকে। যেন এতদিন পরে আবার শুভদৃষ্টি হচ্ছে। বরের গলায় ছিল না, কিন্তু কনের গলায় ঝুলছিল এক চিলতে একটা শুকনো রজনীগন্ধার মালা। বোধ করি মাস ছয়েক আগে শ্রাদ্ধবাসরে মালাটা লটকানো হয়েছিল, খুলে নেওয়া হয়নি। ছ'মাস ধরে যে অঙ্কটা সল্‌ভ করতে পারেননি মুহূর্তে তার সমাধান হয়ে গেল। রজনীগন্ধার শুকনো

মালাটা ফটো-ফ্রেমের উপর যে জ্যামিতিক রেখায় ঝুলছে সেটা অধিবৃত্ত—প্যারাবোলা! কিউ. ই. ডি!

কাক-ডাকা ভোরে ঘুম ভেঙে গেল নিতুনের। রসা রোড দিয়ে দিনের প্রথম ট্রাম যাবার শব্দে। রোজই এ সময় ওর ঘুমটা ভেঙে যায়। না যাবে কেন? সেই সন্ধ্যারাতেই ওর ঘুমের পালা শুরু হয়। বই-খাতার উপর উবুড় হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে টি. ভি.-তে ইংরাজী নিউজ শুরু হবার আগেই। সুরমা ওকে ঠেলে তোলে, ঘুম-জড়ানো চোখে মায়ের হাতে কি খায় না খায় মনেই পড়ে না পরদিন। তাই ভোর রাতে ওর যখন ঘুম ভাঙে তখনও পাড়া নিষুতি। এই সময়টা তাকে সাবধানে থাকতে হয়। পাশের খাটে ড্যাড আর মম্ ভাই-বোনের মতো জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছে। একটু ঠুকঠাক খুটখাট করলেই ওদের ঘুম ভেঙে যাবে—তার মানেই চড়টা-চাপড়টা! অথচ এ সময় বেচারি ঘুমোতেও পারে না আর, চুপটি করে গিয়ে বসে বারান্দায়। গলির দু' ধারে মাথা-খাড়া ঘুমকাতুরে বাড়িগুলো তখনও ঝিমোতে থাকে। তাদের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় এক চিলতে ট্রাম-রাস্তা—সবে আড়ামুড়ি ভেঙে জেগেছে—রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ঝাড়ু হাতে জমাদার, সাইকেলে খবরের কাগজওয়ালা। নিতুন এ সময়ে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে বারান্দায়। দু-একটা কাক ওকে দেখেই এগিয়ে এসে বসে রেলিঙে। ওরা চেনে নিতুনকে। নিতুন ওদের টফি খাওয়ায়, মাকে লুকিয়ে।

আজ কিন্তু ও কাকদের খাওয়াতে গেল না। ঘুম ভাঙতেই ওর মনে পড়ে গেল সেই বুড়োটার কথা। ঐ যে চিলেকোঠার ঘরে চুপচাপ বসে আছে বুড়োটা—কী যেন নাম? হ্যাঁ, মনে পড়েছে: লোকটার নাম 'দাদু'!

মম. বারণ করেছিল। আর বারণ করেছিল বলেই ওর দুরন্ত

কৌতূহল। লোকটা কখনই ছেলেধরা নয়। তাহলে কি ড্যাড ওকে বাড়িতে থাকতে দিত? লোকটাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে গ্র্যানির ঘরে। চিলেকোঠার যে ঘরে এতদিন গ্র্যানি থাকত। ড্যাড অফিসে বেরিয়ে যাবার পর মম্ যখন ঢুকেছে বাথরুমে তখন নিতুন গুটিগুটি উঠে গিয়েছিল উপরের ঘরে। উঁকি দিয়ে দেখেছিল—বুড়োটা একদৃষ্টে তাকিয়ে বসেছিল গ্র্যানির ছবিটার দিকে। নিতুন দ্বারের বাইরে থেকে ডেকেছিল : অ্যাই বুড়ো! তোমার নাম কি?

বুড়োটা দেখতে পেয়েছিল ওকে। হেসেছিল। বলেছিল, আমার নাম দাদু! তোমার নাম কি?

: আমার নাম নিতুন।

ভিতরে এস না! এস, আমার কাছে এস।

: না! মম্ উইল বক্স মাই ইয়ার্স! মম্ বারণ করেছে!··· তুমি তো ছেলেধরা!

লোকটা জবাব দেয়নি।

লোকটা এখন কি করছে? আহা! বুড়োটা আজ মরে যাবে! ভারি দুঃখ হল নিতুনের। 'মরে যাওয়া' ব্যাপারটা নিতুন জানে। মাত্র ছ' বছরের জীবনেই মৃত্যুকে সে চিনে নিয়েছে। মৃত্যুকে দেখেছে খুব নিকট থেকে। 'মরে যাওয়া' মানে এমন একটা 'হাইড অ্যাণ্ড সীক গেম' যখন খেলা সাঙ্গ হলেও লুকনো মানুষটা বেরিয়ে এসে বলে না : হাই!

ওর বেড়ালছানাটা মরে গেছল।

মরে গেছল গ্র্যানিও!

আজ আবার বুড়োটা মরবে! মরবেই! জানে নিতুন। বাপ মা দুজনেই ঘুমোচ্ছে। নিতুন নিঃশব্দে উঠে যায় উপর তলায়। বুড়োটা উঠেছে। খাটের উপর বসে আছে চুপটি করে। সেই ফটোর দিকে তাকিয়ে। ঘরজোড়া মস্ত খাট। চৌকাঠের বাইরে

থেকে সে ডাকল : অ্যাই বুড়ো !

বুড়োটা ওর দিকে তাকালো।

: তুমি কাঁদছ কেন ?—জানতে চায় নিতুন।

বাঁ হাতে চোখটা মুছে নিয়ে বুড়োটা বললে, না, কাঁদিনি তো। কাঁদব কেন ?

: আই নো। তুমি কেন কাঁদছ !

: কেন বল তো ?—বুড়োটা জানতে চায়।

: তুমি আজ মরে যাবে বলে।

: মরে যাব ! কেন ? মরে যাব কেন ?

: বাঃ ! কাল আঙ্কল বলল না মম্‌কে ? গ্র্যানির ছবিটা দেখতে দেখতেই তুমি ফটাশ করে মরে যাবে !

: ও !—বুড়োটা জানতে চায় না 'আঙ্কল' কে ! আপন মনে সে কি যেন ভাবতে থাকে। নিচ থেকে খুটখাট শব্দ হয়। মম্‌ উঠেছে। একছুটে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যায় নিতুন।

চব্বিশ ঘণ্টাও কেটে গেছে তারপর।

কাল এসেছিলেন সকাল আটটায়। এখন বেলা দশটা। কেউ তাঁকে থাকতে বলে নি, কেউ চলে যেতেও বলেনি। লছমন বিদায় হওয়ার পরে অনেকক্ষণ আত্মমগ্ন হয়ে বসেছিলেন বৈঠকখানা ঘরে। যখন বাস্তবে ফিরে এলেন তখন দেখেন ঘরে তিনি একা। সুরমা চলে গেছে রান্নঘরে, ছোট খোকা নিজের শয়নকক্ষে। বৃদ্ধ ধীর পদক্ষেপে উঠে গিয়েছিলেন সাবিত্রীর ঘরে। সেই চিলেকোঠার ঘরখানিতে। যেখানে পাতা আছে সাবেক কালের কল্কা-তোলা বর্মা কাঠের পালঙ্ক। যাতে ফুলশয্যা হয়েছিল ওঁদের। সাবিত্রী ঐ ঘরখানাতেই থাকতেন, তাঁর ঠাকুর-ঠুকুর নিয়ে, ছোঁয়া-ছুঁয়ির বাইরে। বৃদ্ধ সেই যে এ ঘরে এসে ঢুকেছেন, আর বার হননি। নিচে থেকে উঠবার সময় সাবিত্রীর বড় ফটোখানি সঙ্গে করে

এনেছিলেন। কেউ বারণ করেনি, বাধা দেয়নি।

প্রথমটা কেমন যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিলেন। কী নিদারুণ ভুল, কী প্রাণান্তকর ভ্রান্তি। অন্যায় দোষারোপ করেছেন এতদিন সাবিত্রীর নীরবতায়। এ সম্ভাবনার কথাটা একবারও মনে হয়নি। ঐ ছবিখানার দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে সারাদিন শুধু ক্ষমাই চেয়েছেন!

সারারাত ঘুম হয়নি। ঘরজোড়া প্রকাণ্ড পালঙ্কে একা পড়েছিলেন। দক্ষিণের জানলা দিয়ে হু-হু করে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গেছে। সমস্ত অতীত জীবনটা আবার খুঁটিয়ে দেখেছেন। সারা জীবনের পুঞ্জীভূত ভুলভ্রান্তি! ভুলই তো! সাবিত্রী পারেননি, তিনি সংস্কারাচ্ছন্ন; কিন্তু সত্যবান কেন পারলেন না? তিনি তো সংস্কারমুক্ত! জীবনের পথে স্ত্রী যদি পিছিয়ে পড়ে তবে তার হাত ধরে টেনে তোলার দায় তো স্বামীরই। সত্যবান তো পারেননি তাঁর স্ত্রীকে সুখী করতে। সে যা চাইত, সে যা ভালবাসত—কই, তা তো উনি করেননি। সে তো ওঁকে কখনও প্রলুব্ধ করেনি অসৎ হতে, অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে! সারা জীবনভরই তো স্বামীর সঙ্গে কৃচ্ছসাধন করে গেছেন। সনতের ব্যাপারটা? ওটা একটা ব্যতিক্রম অতসীর এতবড় সর্বনাশটা হয়তো তিনি সহ্য করতে পারেননি, সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে উন্মাদ হয়ে পড়েছিলেন সাবিত্রী।

সারাদিন এবং সারারাত কেটে যাওয়ার পর এখন, এই বেলা দশটায় যে অনুভূতিটা ওঁকে পীড়া দিচ্ছে তার জন্য লজ্জায় অধোবদন হলেন সত্যবান। সে অনুভূতিটা কোন অন্তর্যাতনা নয়, নিতান্ত জৈবিক বৃত্তি: ক্ষুধা! গত চব্বিশ ঘণ্টায় কিছু মুখে দেননি তিনি। কাল দিনে নয়, রাতে নয়, আজ সকালেও নয়!

লজ্জা! নিদারুণ লজ্জা! কোন্ মুখে নিচে গিয়ে পুত্রবধূকে বলবেন, ঘরে কিছু আছে মা?

উপব থেকেই দেখলেন, নিতুনে স্কুল বাস এসে দাঁড়ালো! নিতুন স্কুলে গেল। তাবপব এল ছোট খোকার অফিসের গাড়ি। ব্রেকফাস্ট সমাধা করে সেও বেবিয়ে গেল।

কাল সন্ধ্যায় কারা যেন এসেছিল। উপরে আসেনি। আন্দাজ করেছিলেন: ওঁব বৈবাহিক পবিবাবভুক্ত লোকেরা। নিচে জোব পবামর্শ হয়েছিল। সেখানেই বোধ কবি নিতুনেব মামা সান্ত্বনা দিয়েছিল দিদিকে – শ্বশুব-বুড়ো বেশিদিন জ্বালাবে না বোধহয়। 'ফটাশ' কবে মবে যাবে!

ছবিটার দিকে তাকিয়ে বললেন: সেই ভাল। কি বল? পর্বত যদি মহম্মদেব কাছে না যেতে পাবে তাহলে মহম্মদকেই পর্বতেব কাছে যেতে হয়! তাই না? যাব?… ডাকছ?

ছবিব মধ্যে সাবিত্রী হাসলেন শুধু।

সত্যবান তাকে বোঝাতে থাকেন: বেচে থেকে কী লাভ বল? কেউ তো চায় না আমাকে! এখানে এভাবে বেচে থাকা অসম্ভব! লছমন আব বত্না যাই বলুক না কেন। হাত পাতলে ছোট খোকা হয়তো কাশীব ট্রেন ভাড়াটা দেবে। আমাকে বিদায় কবতে। কিন্তু তুমি কি তাই চাও? ওব কাছে হাত পাতব?

সাবিত্রী শিউবে উঠলেন!

: তবেই দেখ! বেঁচে থাকাটা এ-ক্ষেত্রে অসম্ভব। তার চেয়ে তোমার কাছেই চলে যাই? কি বল?

সাবিত্রী জবাব দিলেন না।

বৃদ্ধের হঠাৎ মনে পড়ে গেল। সাবিত্রী ছাড়া আরও একটি আকর্ষণ ছিল তো এই অমৃত ব্যানার্জী রোডের বাড়িটাব! ওঁর সেই রাশি রাশি বই! ঐ তো সেই কাঠের আলমারি! বৃদ্ধ উঠে এলেন। আলমারির পাল্লায় তালা দেওয়া থাকত। এখন তালা নেই। হাট করে পাল্লাটা খুলে ফেললেন।

না! বইগুলি নেই! থিওরি অফ ইকোয়েশান, অ্যালজেবরা,

কনিক সেকশন, ক্যালকুলাস, অ্যাস্টনমি. হাইড্রলিক্স—নেই, কেউ নেই, কিছু নেই। তার পরিবর্তে আছে কিছু পুরাতন বাজে সিনেমা সাপ্তাহিক। স্টার-ডাস্ট, সিনে অ্যাডভান্স, আনন্দলোক। মনটা খারাপ হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন, এ তো ভালই হয়েছে। ছোটখোকা নিশ্চয় অঙ্কের বইগুলো পুরনো বইয়ের দোকানে বেচে দিয়েছে! নিশ্চয়ই তা কাজে লাগছে। নতুন যুগের নতুন ছেলের দল বইগুলি পড়ছে। মার্জিনে ওঁর হাতে লেখা নোট পেয়ে সুবিধাই হচ্ছে তাদের। এর বদলে যদি দেখতেন উই পোকার অত্যাচারে বইগুলো ঝুরঝুরে হয়ে আছে তাহলেই কি খুশী হতেন?

আলমারির নিচের তাকে ওগুলো কী?

সিনেমা সাপ্তাহিকের অরণ্য থেকে উদ্ধার করলেন সেগুলিকে: লক্ষ্মীর পট, পাঁচালি, কোশাকুশি, প্রদীপ, মায় স্ফটিকের শিবলিঙ্গ, চন্দনকাঠের গণেশ আর শ্বেতপাথরের গোপাল। ছেঁড়া ন্যাকড়ায় পুঁটুলি করে বাঁধা। একে একে পেড়ে নামালেন। ধুলো ঝাড়লেন। ধুতির খুঁটে মুছে পাশাপাশি সাজালেন সাবিত্রীর সেই পুজোর জায়গাটায়। পিতলের সিংহাসনে পাশাপাশি বসালেন ওদের। তারপর হঠাৎ সাবিত্রীর দিকে ফিরে বললেন, কী গো? তোমার ঠাকুর-ঠুকুরও তো আজ ছ'মাস উপবাসী! বল, পুজো-টুজো করে দেব? ফুল-বেলপাতা-নৈবেদ্য কিছুই নেই···গঙ্গাজল···ও হ্যাঁ! গঙ্গাজল এখনও আছে শিশিটায়।

সাবিত্রীর দু চোখে মিনতি।

: আচ্ছা বেশ বেশ! আমিও তো উপবাস করে আছি! কিন্তু পৈতে?···কি বললে? কই?

হ্যাঁ, সেটাও খুঁজে পেলেন। লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে পেলেন সাবিত্রীর নিজে-হাতে-কাটা পৈতে! সাবিত্রী চতুর্দশীতে স্বহস্তে প্রস্তুত উপবীত প্রতি বছর সৎ ব্রাহ্মণকে দান করতেন তিনি।

পদ্মাসনে বসেছেন সত্যবান। মেজারমেণ্টটা মনে আছে। ঋক্‌-বেদ! দ্যাট ইজ ফ্রম গলা টু নাভি! কিন্তু ফাঁস দেবার সময় কি একটা মন্ত্র বলতে হয় না?···ইয়েস! প্রবরের আদি পুরুষদের নাম উচ্চারণ করতে হয়! দ্যাটস্‌ ইট!

: ঔর্ব, চ্যবন, এ্যাণ্ড এ্যাণ্ড···? তিন নম্বর ঋষির নামটা যেন কি?

কিছুতেই মনে পড়ছে না। সাবিত্রীর দিকে ফিরে অক্ষমতা স্বীকার করেন: আয়াম সরি! কিছুতেই মনে করতে পারছি না সাবি! আমার দুর্ভাগ্য!

সাবিত্রী খিঁচিয়ে ওঠেন: দুর্ভাগ্য তোমার কেন হবে গো! পোড়া কপাল ঐ জমদগ্নি ঋষির! প্যারাবোলা-স্যারের ছাত্তর নয় যে!

: ও ইয়েস! জামদগ্ন! রোল থ্রি ইজ জামদগ্ন! ঔর্বচ্যবনজামদগ্না-প্লুবৎ প্রবরস্য!

হল পৈতেয় গ্রন্থী দেওয়া। এবং পূজা—

: পানার্থে গঙ্গাজলং, দীপধূপার্থে গঙ্গাজলং, নৈবেদ্যার্থে গঙ্গাজলং, পুনরাচমনায়চ গঙ্গাজলং, তাম্বূলার্থে গঙ্গাজলং···এভরিথিং গঙ্গাজলং!

দেবতাদের এই এক সুবিধা। গঙ্গাজলেই সব ক্ষিদে মেটে।

: এ কি! এ কি! এ কি?—লক্ষ্মীর কৌটোয় সিঁদুর মাখানো নগদ তিনটি টাকা! হাসলেন সত্যবান। বললেন, সাবি! তোমার গৃহলক্ষ্মী বধূমাতার নজরে এগুলো পড়েনি দেখছি!

কিন্তু কী করবেন এ নিয়ে? সাবিত্রী কেন সঞ্চয় করেছিলেন ঐ তিনটি রজতখণ্ড? কী ভাবে ব্যয়িত হলে তৃপ্ত হবে তার আত্মা? আত্মা? মৃত্যুর পর আত্মা থাকে? কোথায় প্রমাণ? The universe is incomprehensible! আইনস্টাইনই বুঝতে পারেননি। তিনি কেমন করে বুঝবেন?

: বল সাবি? দান করব কোন সৎ ব্রাহ্মণকে?···অ্যাঁ? কি বলবে? ধু—স! এই জন্য জমিয়েছিলে?

সাবিত্রীর কথাটা বিশ্বাস হল না। চোখে জল আসে। পাগলীটা

বলে কি! সে নাকি খুশী হবে ঐ তিনটে টাকায় সত্যবান যদি জিলিপি কিনে খান। দেখ দিকি কাণ্ড! কোন মানে হয়? কাশীতে পানিফলের জিলিপি খাওয়াতে চেয়েছিলেন পারেননি। সেদিন পাওয়া যায়নি। কালিঘাটের দোকানেও হয়তো পাওয়া যাবে না। তবু সাবিত্রী খুশী হবেন যদি ঐ তিনটে সিঁদুর-মাখানো টাকায় সত্যবান আজ উপবাস ভঙ্গ করেন!

. বেশ খাব। কিন্তু জিলিপি নয়। ঐ টাকায় যা খেতে চাইব তাই খাওয়াবে তো?

.কৌতুকে নেচে ওঠে সাবিত্রীর দুটি চোখ। বলেন, কী? কী খেতে চাইছ বল তো শুনি?

এক মুঠো স্লিপিং পিল। কেমন? তোমার ঐ সিঁদুর-মাখানো টাকায়!

ত্রিশ নম্বর ট্রামের জানলার ধারে বসে চলেছেন এসপ্লানেড-মুখো। সিদ্ধান্তে এসেছেন এতক্ষণে। কোন উত্তেজনার মুহূর্তে হঠাৎ নেওয়া সিদ্ধান্ত নয়। ধীরস্থির মস্তিষ্কে। যেমন মেজাজে মানুষে অঙ্ক কষে। সাবিত্রীর সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করেই। সাবিত্রীও শেষ পর্যন্ত ঐ পরামর্শ দিয়েছেন। না দেবেন কেন? কোথায়, কোন্ প্রবন্ধে পড়েছিলেন—আত্মহত্যা করার পূর্বমুহূর্তে মানুষ সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্য হারায়। যত্তসব পাগলের কথা! এই তো এখন তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আত্মহত্যা করতে চলেছেন—কই, তাঁর তো মানসিক স্থৈর্য খোয়া যায়নি কিছু? বিশ্বাস না হয় দাও না, দাও ডিফারেন্সিয়াল ইকোয়েশনের একটা বাঘা অঙ্ক, তারপর দেখ।

পাঞ্জাবির পকেটে তিনটে রুপোর টাকা। রুপোর মানে খাঁটি রুপোর! প্রাক-স্বাধীনতা যুগের। না, তিনটে এখন আর নেই। একটা ভাঙিয়েছেন। ট্রামের কণ্ডাক্টার টাকাটা হাতে নিয়ে একটু অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ওঁর দিকে। ও লোকটাও জানে, এ টাকায়

ভেজাল কম, খাঁটি রুপোর। সিঁদুর-মাখানো লাল টাকাটা হাতে নিয়ে লোকটা বার দুয়েক চোরা চাহনিতে ওঁর দিকে তাকিয়েছিল। বলি-বলি করেও কথাটা বলেনি। কপালে ছুঁইয়ে বুক-পকেটে রেখে দিয়েছিল—ওর ঝোলায় নয়, বুক-পকেটে।

এখন ওঁর পকেটে আছে দুটো রুপোর টাকা আর খুচরোয় বারো আনা। না, বারো আনা নয়. পঁচাত্তর নয়া পয়সা। মনে মনে শেষ স্টেপ পর্যন্ত অঙ্কটা কষে রেখেছেন। ট্রামে চেপে যাবেন এসপ্ল্যানেডে। সেখানে পর পর দুটি ওষুধের দোকানে গিয়ে ঘুমের ওষুধ কিনবেন। একই দোকানদারকে দু-দুটো সিঁদুরে-লাল রুপোর টাকা বার করে স্লিপিং পিল কেনার সাহস নেই। লোকটার সন্দেহ হতে পারে। তার পর ভাঙানি যা থাকবে তাই দিয়ে কিছু কিনে খাবেন। হ্যাঁ, সন্দেশই খাবেন। দুরন্ত খিদে পেয়েছে বলে নয়, সাবিত্রী তাঁকে মাথার দিব্যি দিয়ে এটা শর্ত করিয়ে নিয়েছে। স্লিপিং ট্যাবলেট কেনার পরে শেষ কপর্দক পর্যন্ত ব্যয় করে তাঁকে পারণ করতে হবে। সাবিত্রীর লক্ষ্মীর ঝাঁপির ও-টাকা যে ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্য -সাবিত্রী-চতুর্দশীর ব্রত উৎযাপনের জন্য সঞ্চিত। তারপর মেট্রো-সিনেমার উল্টো দিকে ঐ কাশী বিশ্বনাথ জলসত্রে গিয়ে আকণ্ঠ জল খাবেন। ঐ সঙ্গে একমুঠো ট্যাবলেট। খেলেই যে ঘুম আসবে তা নয়। ওখান থেকে তাঁর শেষ শয়নের রঙ্গমঞ্চ একশো গজ হয় কি না হয়। সে পীঠস্থানও মনে মনে স্থির করে রেখেছেন। গণ্ডক নদীতীরে দুই শালবৃক্ষের মধ্যবর্তী সেই স্থানটি জি. ই. সি. কোম্পানির সামনের ছোট্ট ত্রিকোণ পার্কটি। সেই তো ওঁর মত মানুষের কুশীনগর। ঐ ত্রিকোণাকৃতি ভূখণ্ডেই প্রকাণ্ড একটা বই বগলদাবা করে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর আদি গুরু। হোক জজ-সাহেবের পোশাক—উনি জজ-সাহেব নন, বাংলার বাঘও নন, উনি নব্য-বাংলায় অঙ্কশাস্ত্রের ভগীরথ! অল্পেতেই তুষ্ট হতেন তিনি। নিঃসন্দেহে ঠাঁই দেবেন চরণে—জীবনযুদ্ধে পরাজিত ঐ প্রিয় ছাত্রটিকে।

উঃ! কত বদলে গেছে কলকাতা শহর এই পাঁচ বছরে! স্টেশন থেকে কাল ট্যাক্সিতে ফেরবার সময় এসব নজরেই পড়েনি। এখন দেখতে দেখতে চলেছেন। কত বাড়ি উঠেছে—বিশাল বিশাল বাড়ি! মনোহরদাস তড়াগ শুকিয়ে কাঠ। ওখানে কী হচ্ছে ওসব? অত অত যন্ত্রপাতি কেন? ও! ভূগর্ভস্থ রেল? হোক, হোক! আহা, কলকাতার মানুষজন সুখে থাকুন। ওদের বড় কষ্ট।!

এসপ্ল্যানেডের মোড়ে ট্রামটা থামল। এবার সেটা যাবে হাওড়া স্টেশনের দিকে। ট্রাম থেকে নামলেন সত্যবান। সামনেই কে. সি. দাসের মেঠাইয়ের দোকান। কিন্তু না! আগে ওঁকে স্লিপিং ট্যাবলেট কিনতে হবে। ওষুধের দোকান কই?

রাস্তাটা পার হতে গিয়ে দেখেন কী একটা মিছিলে রাস্তাটা জট পাকিয়ে গেছে। মিছিলটা যাচ্ছিল রাজভবনের দিকে। পুলিসে বাধা দিয়েছে। মিছিলের মানুষজন বসে পড়েছে পীচের রাস্তায়। মফঃস্বলের মানুষটি কৌতূহলী হয়ে পড়েন। কী ব্যাপার? যারা বসে আছে তারা পুরুষ এবং স্ত্রী। তাদের মুখোমুখি লাঠি হাতে পুলিস। সত্যবান এগিয়ে গেলেন। নজর পড়ল ওদের ফেস্টুনগুলোর দিকে। ভ্রূকুঞ্চিত হল সত্যবানের। এর মানে কি?

: শিক্ষা নিয়ে ফট্‌কাবাজি চলবে না!

একজন অল্পবয়সী ছোকরা হ্যাণ্ডবিল বিলি করছিল। ধরিয়ে দিল ওঁর হাতে একখণ্ড ছাপা কাগজ। গাড়ি-বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে আদ্যন্ত পড়ে ফেললেন। এরা সবাই শিক্ষক-শিক্ষিকা। ধর্মঘট করেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল বহু—বহুদিন আগেকার কথা। সেই কিষেণগড়ের দিনগুলো। আর মনে পড়ে গেল সে-আমলে ম্যাট্রিক সিলেকশনে এস. ওয়াজেদ আলীর রচনাটির সেই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন: এক্সপ্লেন উইথ রেফারেন্স টু কনটেক্সট্‌—'ভারতবর্ষের সেই ট্র্যাডিসন সমানে চলেছে।'

অনশনক্লিষ্ট বৃদ্ধের মাথাব মধ্যে একবার টলে উঠল। ল্যাম্প-পোস্টটা ধরে সামলে নিলেন। দুটি মেয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একটি অল্পবয়সী, একটি বয়স্কা। দ্বিতীয়া একটি টিনের কৌটো বাড়িয়ে ধরে বলেন, আমাদের ধর্মঘট তহবিলে কিছু চাঁদা দেবেন ?

হাতটা চলে গিয়েছিল পাঞ্জাবিব পাশ পকেটে। তৎক্ষণাৎ সংযত হলেন। তিনি সত্যবদ্ধ। সাবিত্রীকে কথা দিয়েছেন—স্লিপিং-পিল কেনার পরে বাকি শেষ কপর্দক পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ভোজনে ব্যয় করবেন। মনে পড়ল সে কথা। স্বীকার কবলেন অক্ষমতা : মাফ্ কব মা! দেবাব মত পয়সা নেই -

: সিকি-দশ নয়া-পাঁচ নয়া—যা হয় দিন ?

বিব্রত সত্যবান কী জবাব দেবেন বুঝে উঠতে পারেন না। জবাব অবশ্য তাঁকে দিতে হল না। প্রথমা তাঁকে এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল ; এবাবে তাব সঙ্গিনীর দিকে ঘুরে বললে, তুমি ভুল করছ জয়াদি। দেবাব মত পয়সা ওঁব কাছে সত্যিই নেই। উনি মিছে কথা বলেন না—

সত্যবান একটু বিস্মিত। মেয়েটি কি ওঁকে চেনে ? রোগা ছিপ-ছিপে, শ্যামলা বঙ। এক হাতে রিস্ট-ওয়াচ, দ্বিতীয় হাতটি নিরাভরণ, পরনে মিলের কালো পাড় শাড়ি,···বয়স কত হবে ? বছর ত্রিশ। মধ্যবিত্ত ঘরের অনূঢ়া মেয়ে। প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই—সিঁথি সাদা, কপালেও টিপ পরেনি। ঘামে মুখটা তেল চক্‌চকে। প্রশ্নটা না করে পাবলেন না : তুমি কি আমাকে চেন মা ?

মেয়েটি নত হয়ে প্রণাম করল সেই পথের মাঝখানেই—পায়ে হাত দিয়ে। বললে, হ্যাঁ স্যাব, চিনি। আপনি প্যারাবোলা-স্যার তো ?

: হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো তোমাকে···মানে···

: না, আপনি আমাকে কখনো দেখেন নি। আমি আপনাকে দেখেছি দূর থেকে। আমার স্বামীর নাম বললে চিনতে পারবেন···

স্বামী! তাহলে মেয়েটি বিবাহিতা! ক্রিশ্চিয়ান? অথবা মুসলমান? স্বামীর নামটা কি তাহলে জিজ্ঞাসা করবেন? হিন্দু নয় যখন—

মেয়েটি নিজে থেকেই বললে, আমার স্বামীর নাম—হরিপদ দেবনাথ।

চোখ বুজে পুরো এক মিনিট ভাবলেন। তারপর বললেন : কোন ইয়ারে ম্যাট্রিক দেয়?

হাসল মেয়েটি। বললে, না স্যার। আমার স্বামী আপনার ছাত্র ছিলেন না।

: তাই বল। অন্য প্রবরের। সেই জামদগ্ন মুনির মত!

মেয়েটি নিজে থেকেই বললে, একটু দাঁড়ান স্যার। খোকাকে নিয়ে আসি। আপনাকে প্রণাম করবে—

ওঁর অনুমতির অপেক্ষা না করেই মেয়েটি মিলিয়ে গেল ভীড়ে। কে ঐ মেয়েটা? হরিপদ দেবনাথই বা কে? মেয়েটি কি বিধবা? সিঁথিতে যখন সিঁদুর নেই! অথবা হরিপদ কি ক্রিশ্চিয়ান?

: স্যার! আপনি? বাঃ! আপনি কোত্থেকে?

সারা দেশটাই কি ওঁর প্রাক্তন ছাত্রে আকীর্ণ? এবার যে ভদ্রলোক এগিয়ে এসেছেন তাঁর বয়স ষাট-বাষট্টি। এঁকেও চিনতে পারেন নি। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, মাথা ভরা টাক, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি। রীতিমত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক। বলেন, আপনাকে কত খুঁজেছি। ভীষণ দরকার যে আপনাকে। আপনার অমৃত ব্যানার্জী রোডের বাড়িতেও গিয়েছিলাম। আপনার ছেলেও বলতে পারল না আপনি কোথায় থাকেন। কী আশ্চর্য! বাঃ!

: কিন্তু বাবা, তোমাকে তো আমি চিনতে পারি নি এখনও···

: পারবেন কেমন করে? আপনি আমাকে শেষ দেখেছেন সাঁইত্রিশ বছর আগে, সেই—চল্লিশ সালে। যেবার আমি ম্যাট্রিক দিই। আমি শচী স্যার, শচীনন্দন লাহিড়ী।

চিনেছেন এবার। দারুণ ভাল ছেলে ছিল। স্টার পাওয়া ছেলে, চারটে লেটার! বুকে জড়িয়ে ধরেন ছাত্রকে : শচি তুই! হ্যাঁরে—টাক পড়ে গেল কি করে?

: যাবে না স্যার? বাহান্ন বছর বয়স হয়ে গেল যে?

: জগা, বীরু, সতীশ, নবীন,···এরা কে কোথায়?

: জগা মারা গেছে, বীরু ওকালতি করে। সতীশ নবীনের খবর জানি না স্যার।

: তুই কি করিস?

· আপনি যা করতেন—মাস্টারি!

: বাঃ! বাঃ! কিন্তু তুই তো ভাল ছেলে ছিলিস্! মাস্টারি কেন রে?

হাসলেন শচীনন্দন। বলেন, আপনিও তো ভাল ছাত্র ছিলেন স্যাব—

: না, মানে, তুই স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে···

. রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলাম স্যার। অঙ্কেই অনার্স ছিল। পাশ করেছিলাম কিন্তু পাস-কোর্সে।

বৃদ্ধ যেন এই মাত্র কুইনিন মিক্সচার খেয়েছেন!

: তাই তো আপনাকে খুঁজছিলাম স্যার! আপনাকে আমার ভীষণ দরকার!

: কেন বল্ তো? কী ব্যাপার?

বলবার সুযোগ হল না শচীনন্দনের। একজন ছুটে এসে বললে, শচিদা এবার আপনার টার্ন। আসুন।

হারানো মানুষটার হাত ছাড়লেন না শচীনন্দন। বললেন, আসুন স্যার?

: কোথায়?

: আসুন তো আমার সঙ্গে—

শচীনন্দন নামকরা রাজনৈতিক কর্মী। শিক্ষক আন্দোলনের

কর্তাব্যক্তি। রাস্তার ধারে মাইক্রোফোন বসিয়ে কর্মকর্তারা একে একে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। কেন এই শিক্ষক ধর্মঘট। কেন নির্বিরোধী মাস্টার মশায়ের দল ক্লাসঘর ছেড়ে পথে নেমেছেন। শচীনন্দন তাঁর মাস্টার মশায়ের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন মাইক্রোফোনের সামনে। বললেন কমরেডস্! আপনাদের জন্য আমি একটি উপহার নিয়ে এসেছি। এই যে পক্ককেশ বৃদ্ধকে আপনারা দেখছেন, এঁর নাম শ্রীযুক্ত সত্যবান চক্রবর্তী। ইনি আমার গুরু, আমার মাস্টার মশাই। আপনারা নবীন যুগের মাস্টার মশাই, তাই এঁকে চেনেন না। পঞ্চাশ বছর আগে এ বি টি এ.'-তে প্যারাবোলা-স্যারকে সবাই এক ডাকে চিনত। যে সংগ্রামে আজ আপনারা সামিল হয়েছেন এই বৃদ্ধ আজীবন সেই সংগ্রামই করে গেছেন। উনি আপনাদের পূর্বসূরী। দু-একটি উদাহরণ দিই

পারাবোলা-স্যার লজ্জায় সঙ্কোচে আর মাথাটা তুলতে পারেন না। শচীনন্দন এ কী কাণ্ড শুরু করেছে। হাটের মাঝে এভাবে হাঁড়ি ভাঙার কোন মানে হয়? ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ!

মুহুর্মুহু করতালিতে মুখরিত হল সভাস্থল। সভার পরিচালনা করছিলেন যিনি তিনি বললেন, এবার আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রীসত্যবান চক্রবর্তী কিছু বলবেন—

কোন আপত্তিই টিকল না। বাধ্য হয়ে বৃদ্ধকে এগিয়ে আসতে হল। ইতিমধ্যে ওরা কোথা থেকে নিয়ে এসেছে একটা মালা। একটি ছেলে এগিয়ে এসে পরিয়ে দিল সেটা ওঁর গলায়। সবাই হর্ষধ্বনি করে ওঠে।

পিছন থেকে কে একজন চিৎকার করে ওঠে: প্যারাবোলা-স্যার···

অচেনা-অজানা শিক্ষকের দল সমস্বরে সায় দেয়—জিন্দাবাদ!

কী কাণ্ড! কোন মানে হয়?

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে প্যারাবোলা-স্যার বললেন: তোমরা

আমাব নাতিব বয়সী। তোমাদেব আমি চিনি না, তোমাদেব কিসেব সংগ্রাম তাও আমি জানি না। এ সভায় যোগ দেবাব জন্যও আমি আসি নি। এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম আমাব পবম স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান শচীনন্দন আমাকে জোব কবে ধবে এনেছে তোমবা চাইছ, আমি আজ কিছু বলি তাই বলছি আমাব প্রথম কথা তোমাদেব আমি চিনি, তোমবা আমাব অতি পবিচিত প্রজন্ম —তোমবা শিক্ষক। দ্বিতীয় কথা তোমাদেব কিসেব সংগ্রাম তাও আমি জানি তোমাদেব সংগ্রাম অন্যায়েব বিরুদ্ধে আমাব তৃতীয় কথা এ সভায় যোগ দিতে আমি এসেছিলাম স্বইচ্ছায় নয় বিশ্বনিয়ন্তাব বিধানে। কাবণ আমাব অন্তবাত্মা চাইছিল তোমাদেব এ সংগ্রামে সামিল হতে। আমি বৃদ্ধ, অশক্ত বস্তুত কাল থেকে আমি উপবাসী আছি, বড দুর্বল লাগছে। তাই তোমাদেব কাছে ক্ষমা চাইছি। ঈশ্ববেব কাছে একমাত্র প্রার্থনা তোমবা অন্যায়েব সঙ্গে আপস কব না।

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সবে এলেন সত্যবান। তাঁব চোখে তখন দবিগলিত অশ্রু। কে একজন একটা ডাব ওঁব মুখেব সামনে ধবল। সত্যবান আকণ্ঠ পান কবলেন। একটু সুস্থ বোধ কবলেন ভীড়েব মধ্যে কে তাঁব হাত ধবে নিয়ে এল লক্ষ্য হয় নি। প্রকৃতিস্থ হলেন যখন তখন নিজেকে আবিষ্কাব কবলেন কে সি দাসেব মিষ্টিব দোকানে। দই-সন্দেশ পেটে পড়ায় আবাব চোখেব সামনে একে একে সব পার্থিব দৃশ্য ফুটে উঠতে শুরু কবেছে। এতক্ষণে সুস্থ বোধ কবছেন আবাব।

শচীনন্দন বললেন, আপনাকে ট্যাক্সি কবে পৌঁছে দিই স্যাব?

জলেব গ্লাসটা শেষ কবে সত্যবান বলেন, আমি বাড়ি ফিবব না শচি।

: তবে আমাব বাড়িতে চলুন স্যাব?

: তোমাব বাড়ি? কে আছে সেখানে? তোমাব স্ত্রী

: না স্যার ! তাঁর নিয়তি। আপনি বরং তাকে বাঁচাবারই চেষ্টা করেছিলেন। আদালতে যেদিন আপনি এজাহার দেন সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম। তাই তো বলছি, খোকাকে আশীর্বাদ করুন—সে যেন আপনার মত সত্যাশ্রয়ী হয়।

নিবিড় করে শিশুটিকে জড়িয়ে ধরেন বৃদ্ধ তাঁর পাঁজর-সর্বস্ব বুকে।

: উনিও টীচার ছিলেন। তাই তো আমার চাকরি হল। বি. এ-টা পাশ করেছি। এম. এ. দেবার ইচ্ছে আছে। জানি না পারব কি না—

বৃদ্ধ একটু সামলেছেন। পাঞ্জাবির পাশ-পকেট হাতড়ে বার করলেন দুটি রজতখণ্ড আর কিছু খুচরা। বললেন, নাও ধর।

: কী স্যার? টাকা কি হবে?

: তোমার জয়াদিকে দিও। সংগ্রাম তহবিলে আমার চাঁদা। তখন ছিল না, এখন আমার কাছে বাড়তি পয়সা আছে।

তাপসী হাত বাড়িয়ে নিল—সিঁদুর মাখানো লক্ষ্মীর টাকা।

শচীনন্দন ফিরে এসেছেন : আসুন স্যার, ট্যাক্সি পেয়েছি।

চলতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালেন সত্যবান। তাপসীকে প্রশ্ন করলেন, এম. এ. দেবে বলছিলে। কী সাবজেক্টে?

: পিওর ম্যাথস্!

ঠিক আছে তাপসী। আমাকে শচীর বাসায় পাবে। এস তুমি। আমি তোমাকে পড়াব। টিউটোরিয়াল ক্লাস খুলব আমি। অবৈতনিক। পাশ তুমি করবেই! জান তো প্যারাবোলা-স্যার কখনও মিছে কথা বলে না?

সমাপ্ত